আশুতোষ
লাইব্রেরী

সরল রামায়ণ

[ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত]

রামকমল বিদ্যাভূষণ

প্রণীত

মূল্য বার আনা

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

পরম পবিত্র রাম ও সীতার চরিত্রপাঠে সরলমতি বালক ও বালিকাগণের কোমল অন্তঃকরণ সৎপথে পরিচালিত হইতে পারে, এই উদ্দেশেই 'সরল রামায়ণ' প্রচারিত হইল। রামায়ণ অতি সুবৃহৎ গ্রন্থ, তাহাতে উপদেশও নানাবিধ। ধর্মানুরাগ, অপত্যস্নেহ, পিতৃপরায়ণতা, ধর্মনিষ্ঠা, ভ্রাতৃবৎসলতা, পাতিব্রত্য, ন্যায়পরতা, প্রভুভক্তি ও প্রজারঞ্জন প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের পরাকাষ্ঠা, রামায়ণ-ভিন্ন অন্য কোথাও একত্র পরিলক্ষিত হয় না। সংক্ষেপে সরল ভাষায় এতগুলি উচ্চভাবপূর্ণ ঘটনাবলীর সমাবেশ করা অতীব আয়াসসাধ্য। সেই বিষয়ে আমি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, পাঠকবর্গ তাহা বিবেচনা করিবেন। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকখানি বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী করিতে, আমি যথাশক্তি যত্নের ত্রুটি করি নাই। এই 'সরল রামায়ণ' পাঠে বালকবালিকাগণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার দর্শিতে পারে, কোনও সহৃদয় ব্যক্তি অন্ততঃ এইরূপ মনে করিলেও, যত্ন সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

ঢাকা পোগোজ স্কুল,
পৌষ, ১২৯৬ সন

শ্রীরামকমল শর্মা

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

কলেজিয়েট প্রভৃতি ঢাকার কতিপয় স্কুলে, কোনও কোনও জিলা স্কুলে, মফঃস্বলের কয়েকটি বিদ্যালয়ে ও ত্রিপুরা সম্মিলনীর পাঠ্যতালিকায় ইহার স্থান হওয়াতে এবং সাধারণের অনুগ্রহ লাভ করাতে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে। এবার ইহা সংশোধিত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ধিত হইয়া মুদ্রিত হইল। এই সংশোধিত 'সরল রামায়ণ' শিক্ষা-বিভাগের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব। ইতি—

পৌষ,
১২৯৭ সন

শ্রীরামকমল শর্ম্মা
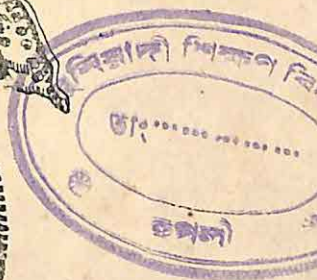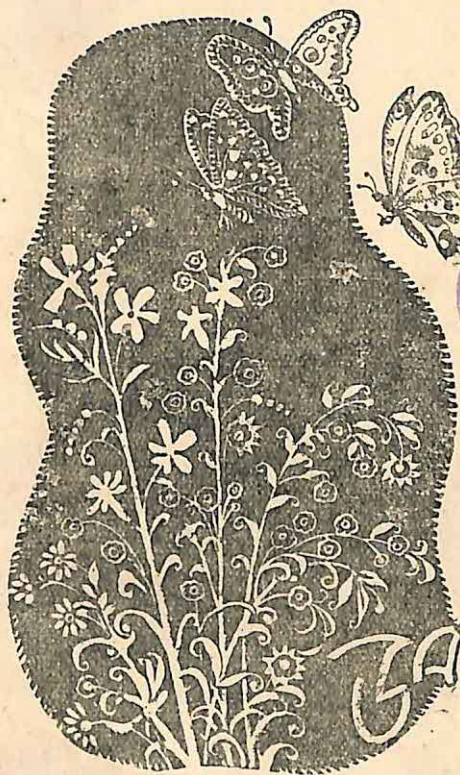
পঞ্চবটী বনে রাম-সীতা

সরল রামায়ণ

আদিকাণ্ড

অতি প্রাচীনকালে সূর্যবংশে দশরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। রাজার সুশাসনে প্রজারা পরম সুখে বাস করিত, তাহাদের কোনও অভাব, কোনও দুঃখই ছিল না। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী দেখা দিত না। চোর-ডাকাতের উপদ্রবও ছিল না।

রাজা দশরথের তিন রাণী ছিলেন। কিন্তু বহুকাল গত হইলেও তাঁহাদের কারও কোন সন্তান জন্মিল না। রাজা এই একটিমাত্র কারণে মনে বড়ই দুঃখ করিতেন। এই দুঃখনিবারণের জন্য তিনি সূর্যবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও সুমন্ত্রাদি প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গনামক এক মুনিকুমারকে আনয়ন করিলেন এবং পুত্রলাভের জন্য তাঁহাকে দিয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ করাইলেন। যজ্ঞে সমারোহের পরিসীমা রহিল না। নানা দেশ হইতে ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও নৃপতিগণ অযোধ্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ বিনীতভাবে সসম্মানে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

এদিকে লঙ্কার রাজা দুরাচার রাবণের অত্যাচারে দেবতারা পীড়িত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া বলিলেন—"ভগবন্! আপনার বর পেয়ে রাবণ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সে এখন আমাদের উপর বড় অত্যাচার করছে। সেই দুষ্ট রাক্ষসের অত্যাচার আমরা আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি দয়া করে আমাদের রক্ষা করবার উপায় করে দিন্।"

দেবতাদের এই কাতর বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"দেবগণ! আমি রাবণের কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে তাকে বর দিতে চাইলে সে আমার কাছে অমর হবার বর প্রার্থনা করেছিল। আমি সেই বর দিতে অস্বীকার করায় সে প্রার্থনা করেছিল যে, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব—কেউ যেন তাকে বিনাশ করতে না পারে। আমি তাকে সেই বরই প্রদান করেছি। কিন্তু রাবণ বর প্রার্থনার সময় নর ও বানরের কথা উল্লেখ করে নি। হয়তো ভেবেছিল—নর ও বানর যখন রাক্ষসের খাদ্য তখন তাদের হাতে তার মৃত্যু হতে পারে না। আমিও সেই জন্যে তাকে নর ও বানরের অবধ্য বলে বর দিই নি। কিন্তু যে-সে নর রাবণের মত বীরকে হত্যা করতে পারবে না। স্বয়ং বিষ্ণু যদি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তবেই তার নিধন সম্ভব হবে। চল, আমরা সকলে ভগবান বিষ্ণুর নিকটে যাই।"

পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর, দেবগণ তাঁহাকে অগ্রে করিয়া ভগবান্ নারায়ণের নিকট গমন করিলেন এবং

সকলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ জনার্দন দেবগণের স্তুতি-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ; পরে তাঁহাদের প্রার্থনা অনুসারে দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। সমবেত দেবগণও বানররূপে মর্ত্যে তাঁহার অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে মহারাজ দশরথের পুত্রকামযজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গ যখন পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন, তখন যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক স্বর্গীয় মহাপুরুষ উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার হস্তে পায়সান্ন-পরিপূর্ণ একখানি সোনার থালা ছিল। তিনি রাজা দশরথকে তাহা দিয়া বলিলেন—"এই পায়সান্ন আপনার পত্নীদিগকে দিন্, তাঁরা এই পায়স ভোজন করলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।" এই বলিয়া সেই দেবপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা দশরথ সেই পায়সান্নের অর্ধেক মহিষী কৌশল্যাকে এবং বাকী অর্ধেক প্রিয়া কৈকেয়ীকে দিলেন। তাঁহারা সুমিত্রাকে ভালবাসিতেন বলিয়া নিজ নিজ ভাগের অর্ধেক তাঁহাকে দিলেন। যথাসময়ে তিন মহিষীর গর্ভ সঞ্চার হইল। এই অবস্থায় তাঁহারা নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এক একটি বালক তাঁহাদের কোল আলো করিয়া শুইয়া আছে, আর লক্ষ্মী যেন তাঁহাদের বাতাস করিতেছেন।

যথাসময়ে কৌশল্যার গর্ভে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে যমজ পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিল। এই খবর শুনিবামাত্র দশরথ আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। তিনি তখনই লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। বন্ধু-বান্ধব অমাত্য সকলেই আনন্দে মগ্ন হইলেন। সারা রাজ্য জুড়িয়া আনন্দ উৎসব ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। সকলে নবজাত রাজকুমারগণের মঙ্গল ও ঐশ্বর্য কামনা করিতে লাগিল।

শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় রাজকুমারেরা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুমারগণ বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; এজন্য তাহাদের শরীরের লাবণ্য ও মুখশ্রী সকল লোকের হৃদয়েই অপার আনন্দসঞ্চার করিতে লাগিল। শৈশবে তাহারা যখন খেলা করিত, তখন সকলে অনিমেষলোচনে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। চারি ভাইএর মধ্যে এত ভালবাসা ছিল যে, কখনও তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধিত না। সর্বদাই তাহাদের মুখে হাসি লাগিয়াই থাকিত। উচ্ছল আনন্দে সর্বদাই তাহারা মাতিয়া থাকিত। সাধারণতঃ তাহাদের পরস্পরে ভালবাসা থাকিলেও, রাম ও লক্ষ্মণে এবং ভরত ও শত্রুঘ্নে কিছু বিশেষ ভালবাসা ছিল। এ জন্যই রাম, লক্ষ্মণ এবং ভরত, শত্রুঘ্ন কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। রাজ-পুত্রেরা সকলের সহিত সর্বদাই হাসিমুখে কথা বলিত, এমন কি দাসদাসীদের প্রতিও তাহারা সুমধুর ব্যবহার করিত। এই

জন্য সকলেই রাজকুমারগণকে অত্যন্ত ভালবাসিত। রাজা ও রাজমহিষীগণও এই স্বর্গীয় শিশুদের লইয়া অত্যন্ত সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

যথাকালে মহারাজ দশরথ কুমারগণের উপনয়নাদি সংস্কার মহাসমারোহে নির্বাহ করিয়া, তাহাদের শিক্ষার জন্য সর্ববিধ শাস্ত্রে পারদর্শী কতিপয় পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। রাজকুমারেরাও স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে অচিরেই বিশেষ যত্নসহকারে বেদবেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিবিধগুণে বিভূষিত হইল। রাম যেমন বয়সে সকলের বড়, সেইরূপ নানাবিধ গুণেও সকলের শ্রেষ্ঠ হইল।

রাজা দশরথ পুত্রগণ-সহ পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদিন বিশ্বামিত্র মুনি রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহার সমুচিত সমাদর করিলেন। মহর্ষি আসনে উপবেশন করিলে, মহারাজা সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—"ভগবন্! আপনার আগমনে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। আপনাকে দেখে আমি নিজকে ধন্য জ্ঞান করছি। আপনার কি প্রয়োজন বলুন। আমি এখনই তা সম্পন্ন করব।"

রাজা এই কথা বলিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন—"মহারাজ! দুরন্ত রাক্ষসেরা অনেক সময়ে আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করে থাকে। এজন্য আমরা আমাদের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে যথানিয়মে সম্পন্ন করতে

পারি না। সম্প্রতি আমি এক বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে চাই। এই যজ্ঞে যাতে কোন বিঘ্ন না হয়, এজন্য আমি রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে চাই। এখন আপনি অনুমতি করলেই হয়।"

এই কথা শুনিয়া রাজা দশরথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। দুরন্ত রাক্ষসের সম্মুখে তিনি কেমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের মত দুই সুকুমার কিশোরকে পাঠাইবেন? তিনি দুশ্চিন্তায় রীতিমত অস্থির হইয়া উঠিলেন।

রাজা সবিনয়ে বলিলেন—"ভগবন্, রাম ও লক্ষ্মণ এখনও যোলো বৎসর বয়স অতিক্রম করে নি। তারা এখনও বালক, সেই জন্যে অস্ত্রবিদ্যায়ও তেমন পারদর্শী হয়ে ওঠে নি। কেমন করে তারা দুর্দান্ত রাক্ষসদের নিবারণ করবে? আপনার যত সৈন্য লাগে, যত অস্ত্র লাগে আমি দিচ্ছি. এমন কি আমি নিজেও আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শিশু রাম-লক্ষ্মণকে আপনার সঙ্গে দিতে আমার মন চাইছে না।"

এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন— "সৈন্য বা আপনাকে দিয়া আমার কোন দরকার নেই। আমি চাই রাম-লক্ষ্মণকে। যদি তাদের যেতে না দিন্ তো বলুন. আমি এখনই চলে যাচ্ছি।"

বিশ্বামিত্রের রাগ দেখিয়া রাজা অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেন। পাছে ব্রহ্মশাপ লাগে এই ভয়ে তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ পিতার আদেশে মুনির সহিত চলিলেন। রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে শুনিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র ভীত হইলেন না।

সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন —"তুমি শীঘ্র সরযূ নদীতে স্নান করে আমার কাছে এস, আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামে দুইটি বিদ্যা প্রদান করছি। এই বিদ্যায় তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হতে পারবে। এই বিদ্যা শিখলে তোমায় ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুতেই অস্থির করতে পারবে না। পৃথিবীতে কেবল তুমিই এই বিদ্যালাভের উপযুক্ত পাত্র।"

রাম ঋষির কথামত সরযূ নদীতে স্নান করিয়া সেই বিদ্যা লাভ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নানাবিধ পুরাতন গল্প শুনাইতে লাগিলেন; সেই সকল মনোহর গল্পে তাঁহাদের মন এতই নিবিষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহারা পথশ্রমজনিত কোন ক্লেশই অনুভব করিতে পারেন নাই।

এইরূপে বহু পথ পার হইয়া রাম-লক্ষ্মণ একটি বনের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন—"বৎসগণ! মারীচ রাক্ষসের মা তারকা রাক্ষসী এই বনে বাস করে। তার ভয়ে কেউ এই বনের কাছে আসতে পারে না। তোমরা যদি তারকাকে মেরে ফেলতে পার, তবে বহু লোকের উপকার হবে। দুষ্টা রাক্ষসীকে হত্যা করলে স্ত্রী-হত্যার পাতক হবে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র রাম তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধনুকে টঙ্কার দিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া তারকা রাক্ষসী ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে রামের সামনে হাজির হইল। তাহার চলার বেগে বনের গাছপালা ভীষণভাবে দুলিয়া উঠিল। রাম রাক্ষসীকে দেখিবামাত্র এক তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই অব্যর্থ বাণের আঘাতে তারকার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল।

পরে রামচন্দ্র অর্ধচন্দ্র বাণে সুবাহু রাক্ষসকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। বায়ব্য নামক এক ভীষণ অস্ত্রে তিনি মারীচকে বহুদূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সেনাপতি দুইজনের এই রকম দুরবস্থা দেখিয়া অন্য রাক্ষস ভয়ে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণের বীরত্ব দেখিয়া বিশ্বামিত্র সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। এই সময়ে জনকরাজার যজ্ঞে যাইবার জন্য বিশ্বামিত্র নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি রাম-লক্ষ্মণকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"রাজর্ষি জনকের গৃহে মহাদেবের অতি বৃহৎ এক ধনু আছে। জনক পণ করেছেন, যে বীর ঐ ধনু ভাঙ্গতে পারবে, তাঁকেই তিনি তাঁর অনুপম গুণবতী ও রূপবতী দুহিতা সীতাকে সম্প্রদান করবেন। এপর্যন্ত কত বীর সেখানে উপস্থিত হয়েছেন; ধনুর্ভঙ্গের কথা কি বলব, কেউ সেই ধনু তুলতেও পারেন নি।"

ইহা শুনিয়া রাম-লক্ষ্মণের মনেও সেই অদ্ভুত ধনু দেখিবার

জন্য ইচ্ছা হইল। তাই তাঁহারা দুই ভাই পরমানন্দে বিশ্বামিত্রের সহিত রাজর্ষি জনকের রাজসভায় যাত্রা করিলেন।

সায়ংকালে তাঁহারা গৌতম মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তথায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন। গৌতমের শাপে তাঁহার পত্নী অহল্যা আশ্রমের এক কোণে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন রামের পদধূলি পাইয়া অহল্যা পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইলেন। পরদিন তাঁহারা জনকভবনে উপনীত হইলেন।

রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রের সহিত কিশোর রাজকুমারদিগকে দেখিয়া বিধিমতে তাঁহাদের সমাদর করিলেন। রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইয়া বিশ্বামিত্র মুনি জনক রাজাকে বলিলেন—"এই বালক দুটি সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের পুত্র। এরা আপনার ধনু দেখবার জন্য আমার সাথে এসেছে। অতএব ধনুখানি আনবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ করুন।"

রাজর্ষি জনক রাম ও লক্ষ্মণের মনোহর আকৃতি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"যদি আমি ধনুর্ভঙ্গের পণ না করতাম, তবে এইরূপ সদ্বংশজাত ও রূপলাবণ্যপূর্ণ যোগ্যপাত্র কখনই পরিত্যাগ করতাম না।"

জনক অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন—"ভগবন্! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষরা যে ধনু তুলতে পর্যন্ত পারেন নি, সেই ধনু এই বালকদের সামনে এনে লাভ কি?"

বিশ্বামিত্র দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"এই সামান্য বালকের মধ্যেও মহাশক্তি নিহিত রয়েছে। সামান্য আগুন যেমন

মহাশক্তিতে গ্রামকে ভস্মীভূত করতে পারে, তেমনি রামের দ্বারা কঠিন শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।”

তারপর জনকের আদেশে সেই মহাধনু সভামধ্যে আনীত হইল। রামচন্দ্র অনায়াসেই তাহা ধরিয়া তুলিলেন এবং তাহাতে গুণসংযোজন করিয়া এমনই বলে আকর্ষণ করিলেন যে, সেই আকর্ষণেই ধনুখানি ভাঙ্গিয়া গেল। তাহা দেখিয়া জনকের ও বিশ্বামিত্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

অনন্তর রাজা জনক বিশ্বামিত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা দশরথের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজা দশরথও এই সংবাদ-শ্রবণে পরম পুলকিতচিত্তে ভরত-শত্রুঘ্ন, বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণকে লইয়া অচিরকাল মধ্যেই মিথিলা নগরে উপনীত হইলেন।

মিথিলাধিপতি রাজা দশরথকে সমুচিত সমাদর করিয়া বলিলেন—“মহাশয়! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের অলৌকিক কার্য ও অসাধারণ শক্তি দেখে আমি খুবই প্রীত হয়েছি এবং ধনুর্ভঙ্গের পণ অনুসারেই ধরণীসম্ভূতা আমার পালিতা কন্যা সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করতে প্রস্তুত হয়েছি। অতঃপর, আপনার অন্য পুত্রদের রূপগুণের কথা শুনে আমার ইচ্ছা হয়েছে যে, আমার অপর কন্যা উর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে এবং আমার ভ্রাতৃদুহিতা মাণ্ডবীকে ভরতের হস্তে ও শ্রুতকীর্তিকে শত্রুঘ্নের হস্তে সম্প্রদান করি।”

রাজা দশরথ তাঁহার এই প্রস্তাব হৃষ্টচিত্তে অনুমোদন করিলে, যথাবিধানে তাঁহাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হইল।

বিবাহ-উৎসব শেষ হইলে রাজা দশরথ জনক রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুত্র ও পুত্রবধূগণ-সহ আপনার রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। পথিমধ্যে ক্ষত্রিয়কুলের পরম শত্রু পরশুরাম সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দশরথ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার নিকটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

পরশুরাম ক্রোধভরে রামচন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে তোর এত সাহস বেড়ে গেছে যে, তুই হরধনু ভেঙ্গে নিজকে একটা মহাবীর বলে মনে করছিস্। ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংসকারী পরশুরামের নাম কখনও শুনেছিস্? পিতার শত্রুকে নিধন করবার জন্যে আমি একুশ বার এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছি। রাম বলতে লোকে এতদিন আমাকেই বুঝত। এখন তুই সেই সম্মানের অংশ নিতে চাস্ দেখছি। ভাল কথা, আমার কাছে তোকে শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। আমার এই ধনুতে গুণ পরিয়ে বাণ সংযোগ কর্ দেখি।"

রামচন্দ্র পরশুরামের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া, বিনীত-ভাবে হাসিতে হাসিতে তাঁহার হাত হইতে ধনুখানি লইয়া অনায়াসে তাহাতে বাণযোজনা করিলেন। তাহা দেখিয়া

পরশুরাম অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া রামচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

পরশুরাম পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে দশরথের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। তিনি পুত্রের বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া মহা আনন্দে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড
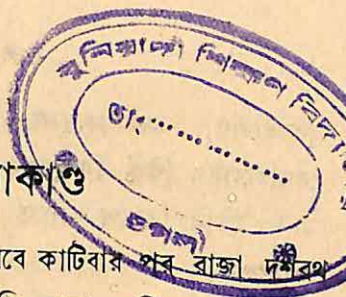
কিছুকাল আনন্দে ও মহোৎসবে কাটিবার পর রাজা দশরথ স্থির করিলেন যে, রামকে তিনি রাজা করিবেন। একদিন তিনি ঘোষণা করিলেন,—আগামী কাল আমি রামকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করিব।

তাঁহার আদেশে এই সংবাদ রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত করা হইল। প্রজাগণ এই সুসংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

মধ্যম মহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নামে এক দুষ্টস্বভাবা দাসী ছিল। সে ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং নির্জনে যাইয়া কৈকেয়ীকে বলিল—"যদি তুমি নিজের মঙ্গল চাও, তবে যাতে রাম রাজা না হয়ে ভরত রাজা হতে পারে, তার উপায় কর।"

কৈকেয়ী প্রথমতঃ মন্থরার কথায় বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অবশেষে মন্থরার নানাবিধ কুমন্ত্রণায় তাঁহার বুদ্ধি আর স্থির রহিল না। তিনি মন্থরার পরামর্শমত অগ্রে রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া পরে প্রার্থনা করিলেন—"মহারাজ! আপনি আমার ভরতকে রাজা করে ও রামকে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে পাঠিয়ে আপনার প্রতিজ্ঞাপালন করুন।"

কৈকেয়ীর এই নিদারুণ প্রার্থনায় রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন।

বহুক্ষণের পরে চৈতন্য লাভ করিয়া, রাজা কৈকেয়ীকে কত

বুঝাইলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, কত বা ভয় দেখাইলেন ; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার দুর্মতি ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি বিলাপ করিতে করিতে ধূলিশয্যায় রজনী যাপন করিলেন।

রামচন্দ্র পিতার চরণ দর্শন ও বন্দনা করিবার জন্য প্রভাতে পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা নীরবে ভূমিতলে পড়িয়া আছেন ; তাঁহার সর্বশরীর ধূলি-ধূসরিত এবং চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। রাজার এই অবস্থা দেখিয়া, রাম অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর হইয়া কৈকেয়ীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর, তিনি কহিলেন, "বৎস ! রাজার কোনও অসুখ হয় নি ; তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমি যা বলব, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করেই তুমি তা পালন করবে, তবে আমি রাজার মনের অভিপ্রায় তোমাকে বলতে পারি।"

রাম কৈকেয়ীর কথায় ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"দেবি ! পিতার আদেশ প্রতিপালন করাই পুত্রের ধর্ম। সে আদেশ ন্যায় কি অন্যায়—এ কথা বিচার করবার অধিকার আমার নেই। এ বিষয়ে আপনি আমায় সন্দেহ করবেন না। আপনি নিশ্চয় জানবেন, আমি পিতার আদেশে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি।"

স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল রামচন্দ্রের এইরূপ মধুর বাক্য শুনিয়া ক্রূরমতি কৈকেয়ী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরে রাজা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তিনি নিজে যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন,

সকলই রামের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রাম তাহা শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, বরং প্রফুল্লচিত্তে রাজার আদেশ প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন —"পিতার ও আপনার আজ্ঞা ঈশ্বরের আদেশের ন্যায় আমার শিরোধার্য। আমি মাতার নিকট হতে বিদায় নিয়ে অবিলম্বে বনে গমন করছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক মহারাজকে শান্ত করুন এবং সেবাশুশ্রূষাদ্বারা তাঁর মনোদুঃখ দূর করুন।"

রাম এই বলিয়া, রাজা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া মাতার নিকট গমন করিলেন। তাঁহার প্রস্থান-কালে রাজা দশরথ "হা রাম" এইমাত্র বলিয়াই আর কিছু বলিতে পারিলেন না; দুঃখে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি কেবল নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৌশল্যা রামের মঙ্গলের জন্য নিজ অন্তঃপুরমধ্যে নানাবিধ শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাম তথায় উপস্থিত হইয়া মাতার চরণে প্রণিপাতপূর্বক সমুদয় বিবরণ যথাযথ নিবেদন করিলেন।

রামের মুখ হইতে সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া কৌশল্যা শোকে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রাম মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, আপনি শান্ত হয়ে আমায় বনবাসে যেতে অনুমতি দিন। পিতা পরম গুরু। পিতার আদেশ আমার কাছে সব আদেশের চেয়ে বড়। আমি বনে না গেলে তাঁর সত্য পালন হবে না। আর তাতে

আপনিও সুখী হবেন না। আমি পিতৃসত্য পালনের জন্যে বনে যেতে চাই।”

রামের কথা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ হইলেও কৌশল্যা কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। রামকে না দেখিয়া তিনি কেমন করিয়া থাকিবেন ? এই চিন্তায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। রাজভবনের সকলেই এই দুঃসংবাদে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল। আনন্দের পরিবর্তে বিষাদ ও রোদন-ধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ পরিপূর্ণ হইল।

লক্ষ্মণ রামের চিরসহচর। তিনি রামকে বনগমন হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত নানামতে অনুনয়-বিনয় করিলেন ; কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, রামের মন পর্বতের মত অচল ও অটল, কোন মতেই পরিবর্তিত হইবার নহে, তখন নিজেও তাঁহার সঙ্গে বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বলিলেন —“দাদা ! যদি একান্তই আপনি বনে যাবেন, তবে আমাকেও আপনার সঙ্গে নিতে হবে।”

গৃহে থাকিয়া পিতামাতার শুশ্রূষা করিবার জন্য রাম, লক্ষ্মণকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোনও ক্রমেই বনগমনের সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না ; অগত্যা তাঁহাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন।

রামচন্দ্র মধুরবাক্যে জননীকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং তাঁহার কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, অবিলম্বে জনকনন্দিনীর ভবনে উপনীত হইলেন। রামের

রাজ্যাভিষেক-বার্তায় সীতা যেরূপ সুখী হইয়াছিলেন, সহসা রামমুখে তাঁহার বনগমনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তদপেক্ষা সহস্রগুণে দুঃখিতা ও ম্রিয়মাণা হইলেন এবং কাতরবাক্যে বলিলেন—"আর্যপুত্র! যদি আপনি বনগমনেই কৃতনিশ্চয় হয়ে থাকেন, তবে আমাকেও আপনার সঙ্গিনী করতে হবে।"

রাম বলিলেন—"প্রিয়তমে! তুমি রাজনন্দিনী এবং রাজ-পুত্রবধূ; দুঃখ কাকে বলে তোমার তার ধারণাই নেই। বনবাসে কত কষ্ট ভোগ করতে হয় তা তুমি জান না। সেখানে যেতে অনেক পথ হাঁটতে হয়। সেই পথের কষ্ট আর প্রখর রৌদ্র তোমার সহ্য হবে না। বনে গাছের ফল খেয়ে গাছতলায় মাটির উপর শুতে হয়। তুমি এত কষ্ট কেমন করে সহ্য করবে? তার চেয়ে তুমি গৃহে থেকে গুরুজনদের সেবা কর।"

সীতা বলিলেন—"আপনি যে কষ্ট সহ্য করবেন, আমি তা সহ্য করতে পারব না কেন? আপনারও ত আর এ কষ্ট অভ্যস্ত নয়; আপনার সহ্য হলে, আমার সহ্য হবে না কেন? আর আপনি বনগমন করলে, আমি কোন্ সুখে বা কোন্ প্রাণে রাজভবনে বাস করব? আপনি গাছতলায় মাটিতে শয়ন করবেন, আর আমি পালঙ্কে সুখে নিদ্রা যাব; আপনি বনফল আহার করবেন, আর আমি রাজভোগে এই উদর পূরণ করব; তা কি কখন হয়? কোনও মতেই তা হবে না। নারীর পতিই একমাত্র গতি; পতির সুখেই তাদের সুখ, আর পতির

দুঃখেই তাদের দুঃখ; তাদের আর পৃথক্ কোন সুখ নেই। আপনার নিকটে থেকে আমি বনেও সুখে কালযাপন করতে পারব; কিন্তু আপনি বনে গেলে এই রাজভবনেও আমার দুঃখের পরিসীমা থাকবে না। অতএব আমাকে সঙ্গে নিতে আর কোনও রূপে দ্বিধা করবেন না।"

সীতার এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া রাম অগত্যা তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন।

তাঁহারা তিনজনেই নিজ নিজ ধনরত্ন ও বসনভূষণাদি ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীদিগকে দান করিলেন। পরে কৈকেয়ীর ইচ্ছামত বনবাসের উপযোগী বল্কল পরিধান করিয়া রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য পুর-বাসিগণ সকলে আসিয়া রাজপথে সমবেত হইল এবং রামের বনগমনে ব্যথিত হইয়া, রোদন করিতে করিতে ক্রূরমতি কৈকেয়ীকে নানাপ্রকার ধিক্কার দিতে লাগিল। উপস্থিত জনগণ সকলেই দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল যে, রামের চির-প্রফুল্ল মুখ বনগমনের সময়ও পূর্বের মত প্রফুল্লই রহিয়াছে, একটুও মলিন হয় নাই। রাম, সমাগত জনগণকে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নগর-বাসিগণ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল, ততক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। যখন তাঁহারা দৃষ্টি-পথের অতীত হইলেন, তখন সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

অযোধ্যানগরী পুরবাসিগণের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। সোনার অযোধ্যা শ্মশানে পরিণত হইল।

রাজা দশরথ যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্র বনে গমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার শোকানল শতগুণে প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি আর কোনও মতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রিয়তমা কৈকেয়ীর ভবন তখন তাঁহার নিকট যমালয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কৈকেয়ীকে মায়াবিনী রাক্ষসী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সেখানে আর তিলার্ধকালও থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তাঁহার আদেশ ও ইচ্ছায় পরিচারিকাগণ শীঘ্রই তাঁহাকে আর্যা কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল।

এদিকে রাজ্ঞী কৌশল্যা হৃদয়নন্দন একমাত্র পুত্রকে অনিচ্ছায় বনগমনের অনুমতি দিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কাতরকণ্ঠে বিলাপ করিতেছিলেন ; দশরথের আগমনে তাঁহার শোকসাগর আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল। রামজননীর করুণ-বিলাপে দশরথেরও শোকাবেগ দ্বিগুণ হইল। তিনি অবশেষে মূর্চ্ছিত হইলেন। পতিপ্রাণা কৌশল্যা দশরথের এই দশা দেখিয়া, নিজের শোক দুঃখ ভুলিয়া গিয়া তাঁহারই শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় রাজা অচিরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া একদৃষ্টে কৌশল্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তারপর রাজা দশরথ ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন—

"দেবি! আমার মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই। তুমি মনে করেছ, আমি কৈকেয়ীর ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে রামকে বনে পাঠিয়েছি। এ বিষয়ে কিন্তু কৈকেয়ীর দোষ নেই। এ আমারই পাপের বিষময় ফল। তাহলে শোন সেই ঘটনা। যৌবনে একদিন আমি মৃগয়ার জন্যে বনে ভ্রমণ করছিলাম, এমন সময় সরযূনদীর তীরে হাতির ডাকের মত একটি ডাক আমি শুনতে পেলাম। তখনি আমি সেই শব্দ লক্ষ্য করে শব্দবেধী বাণ নিক্ষেপ করলাম, আর সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলাম একটি বালক—'হা পিতঃ' 'হা মাতঃ' বলে অতি করুণ স্বরে রোদন করছে। আমি তখনি সেই স্থানে গিয়ে দেখলাম, আমার বাণ এক মুনিকুমারের বুকে বিঁধেছে। তখনি সমস্ত বিষয় আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল। মুনিকুমারের কলসীতে জল ভরবার শব্দ শুনে আমি হাতির শব্দ মনে করেছিলাম। পরে বালকের পরিচয় নিয়ে জানলাম, তার পিতা-মাতা বৃদ্ধ ও অন্ধ, আর সেই বালকই তাঁদের একমাত্র অবলম্বন। আমার দুঃখ ও অনুশোচনা দেখে সেই বালক বুঝতে পারল, আমি না জেনে ভুলক্রমে এই কাজ করেছি। তাই সে আমাকে ক্ষমা করে আমাকে অনুরোধ করল, 'আপনি এই জল নিয়ে আমার অন্ধ পিতা-মাতার নিকট যান। তাঁরা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আছেন।' আমি মুনিকুমারের কথামত কাজ করলাম। তার অন্ধ পিতা-মাতা বহুক্ষণ পুত্রের জন্য বিলাপ করে পুত্রের সঙ্গে চিতানলে জীবন বিসর্জন দিলেন। মৃত্যুকালে তাঁরা আমাকে

অভিশাপ দিলেন—'আমরা যেমন নিরুপায় হয়ে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করলাম, তোমারও ঠিক সেই দশা হবে'।"

এই কথা বলিতে বলিতেই রাজা দশরথের মৃত্যু হইল।

পুরোহিত ও অমাত্যগণ পরামর্শ করিয়া রাজার মৃতদেহ এক তৈলপূর্ণ পাত্রে রাখিলেন এবং অবিলম্বে দূত পাঠাইয়া ভরতকে তাঁহার মাতুলালয় হইতে আনাইলেন।

মহাত্মা ভরত, রামের বনগমন ও পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠ এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে বুঝাইয়া রাজকার্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোনমতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রাপ্য রাজ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অবিলম্বে পিতার মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার করিয়া যথাকালে তাঁহার শ্রাদ্ধতর্পণাদি সুসম্পন্ন করিলেন। পরে রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার খোঁজে বাহির হইলেন।

এদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সন্ধ্যায় তমসানদীতীরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নসময়ে তাঁহারা ভাগীরথীর তীরে যাইয়া স্নান করিলেন। লোকমুখে এই খবর শুনিয়া রামের বন্ধু গুহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র প্রফুল্লহৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরমমিত্র গুহ অনেক

অনুরোধ করিলেও রাম প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে তাঁহার নগরে প্রবেশ করিলেন না। পরদিন তাঁহারা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাইয়া নানাবিধ সদুপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে সেই দিন সেইখানেই অবস্থান করিলেন। তাহার পরে সেখানে হইতে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির আশ্রমে গমন করিলেন এবং কিছুদিন তাঁহার সহিত সদালাপে অতিবাহিত করিয়া তাঁহার নির্দেশে চিত্রকূট পর্বতে পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিনের পরেই ভ্রাতৃবৎসল ভরত, রামের অনুসন্ধান করিতে করিতে পরিজনসহ চিত্রকূটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ভরতের মুখে পুত্রবৎসল পিতার পরলোকগমন শুনিয়া একান্ত অধীর হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের উপদেশে কিছু ধৈর্য ধারণ করিয়া যথাবিধানে পিতৃতর্পণ সম্পাদন করিলেন।

বনবাস হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য ভরত রামকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে রাম বলিলেন—"ভাই! সত্যপালন ও ধর্মরক্ষার জন্য স্নেহশীল পিতা প্রাণত্যাগ করলেন, আর আমি কি তাঁর এমনই নরাধম পুত্র যে, তুচ্ছ রাজ্যসুখের জন্য সত্য ও ধর্মকে পরিত্যাগ করব?"

ভরত বলিলেন—"আর্য! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বর্তমান থাকতে কনিষ্ঠের রাজ্যগ্রহণ নিতান্ত অন্যায়। আমি কোনমতেই সে কাজ সঙ্গত মনে করছি না। আপনি যদি একান্তই অযোধ্যায়

গমন না করেন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে এই চতুর্দশ বৎসর বনেই বাস করব।”

রাম বলিলেন—“বৎস ভরত! আমি যেমন বনে এখন পিতার সত্য প্রতিপালন করছি, সেইরূপ প্রজাপালন করে তোমারও পিতার সত্য প্রতিপালন করা উচিত। তা না করলে তোমার অধর্ম হবে। এখন আমার অনুরোধ রক্ষা করে পিতার সত্য পালন কর।”

ভরত যখন বুঝিলেন যে, রামের আজ্ঞা ও পিতার সত্য পালন করা, তাঁহার নিতান্ত কর্তব্য, তখন রামের পাদুকা লইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। তাহার পর রামের পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, অযোধ্যার নিকটবর্তী নন্দিগ্রামে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন এবং রামের ন্যায় জটাবল্কল ধারণ ও ফলমূল আহার করিয়া মাতৃ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূটে বাস করিতেছেন, ইহা জানিয়া প্রজাগণ দলে দলে তথায় আসিতে লাগিল। ইহাতে রাম পিতৃসত্যপালনে বিঘ্নের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। পরে বহুদূরে অবস্থান করিবার জন্য চিত্রকূট হইতে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা অত্রি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, অত্রিপত্নী অনুসূয়া সীতাকে বলিলেন—‘বৎসে। আমি তোমার পতিপরায়ণতায় অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার এই মতি অচলা হোক্, কুল-

কামিনীরা সকলেই তোমার সদাচরণের অনুসরণ করুক, তবেই জগৎ পবিত্র হবে। তুমিই নারীধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝেছ। পতিই নারীর প্রিয়তম বন্ধু, পরম গুরু ও উপাস্য দেবতা এবং পতিসেবাই নারীর সনাতন ধর্ম। পতিশুশ্রূষাতেই সাবিত্রী স্বর্গবাসিনী হয়েছেন। পূর্বজন্মের পতি-সেবার ফলেই চন্দ্র রোহিণীকে মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করেন না. একথা সর্বদা মনে রাখবে।"

সীতা বিনীতভাবে অনুসূয়ার উপদেশ শিরোধার্য করিয়া অতিশয় ভক্তিভরে তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। পরে মুনি ও মুনিপত্নীগণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্যকাণ্ড

তাঁহারা শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের আশ্রমে কিছুদিন বাস করিবার পর অগস্ত্য মুনির উপদেশে তাঁহার আশ্রমের কিছু দূরে পঞ্চবটী নামক স্থানে একটি কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই কুটীরের চারিদিকে ফল ও ফুলের গাছ। খুব নিকটে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা গোদাবরীর পবিত্র নির্মল জলে নিত্য স্নানতর্পণাদি করিতেন এবং মনোহর দূর্বাদলপরিপূর্ণ তীরপ্রদেশে বিচরণ করিয়া শীতল বায়ু সেবন করিতেন। লক্ষ্মণ যথাসময়ে নিকটের তরু হইতে বিবিধ ফল আহরণ করিয়া আনিতেন এবং সকলে মনের সুখে সেই সকল সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়াই অনায়াসে জীবন ধারণ করিতেন। বনে বাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের কাহারও মনে কোনও দুঃখই উপস্থিত হইত না। তাঁহারা কখনও বা মুনি এবং মুনিপত্নীগণের সরল ও সদয় ব্যবহারের কথা, কখনও বা অযোধ্যাবিষয়ে নানা কথা বলিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতীত হইল। একদা তাঁহারা তিন জনে প্রীতমনে কুটীরের নিকটে বসিয়া নানাবিধ কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী শূর্পণখা, জনস্থান হইতে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে

করিতে পঞ্চবটীবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামের অনুপম ও অতি মনোহর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। তখন সে মায়াবলে পরমাসুন্দরী রমণীমূর্তি ধরিয়া, মান ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া রামের নিকটে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। রাম তাহার প্রস্তাবে নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিলেন; তথাপি সে বার বার রামকে বহুবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। শূর্পণখার এইরূপ বিসদৃশ নির্লজ্জ ব্যবহারে সীতার মুখে একটু মৃদু মধুর হাসির আবির্ভাব হইল। সীতার এই উপহাসের হাসি শূর্পণখা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে সহসা আপনার স্বাভাবিক বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া সীতাদেবীকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অতি তীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন। রাক্ষসী শূর্পণখা এইরূপে অপমানিত হইয়া অদূরবর্তী আপনার বাসস্থান জনস্থানে প্রতিগমন করিল এবং আপনার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত খর ও দূষণকে নিজের দুরবস্থা জানাইল। রাক্ষস-সেনাপতিদ্বয় তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসেনা লইয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। সীতাকে লক্ষ্মণের নিকট রাখিয়া রাম একাকী সেই রাক্ষসসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে সমুদয় সৈন্য বিনাশ করিয়া অবশেষে খর-দূষণকেও সংহার করিলেন।

শূর্পণখা নিরুপায় হইয়া লঙ্কায় গমন করিল এবং অতিকাতরে নিজের দুরবস্থা ও খরদূষণের নিধনবার্তা রাবণকে জানাইল। রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া তখনই রাম-লক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত একাকী রথে আরোহণ করিলেন।

শূর্পণখা রামের অসীম বিক্রমের কথা রাবণকে জানাইয়া বলিল—"দাদা! আপনি একা রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন না। তার চেয়ে আপনি এক কাজ করুন। রামের সঙ্গে তার স্ত্রী সীতা আছে। সীতার মত পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক আর ত্রিভুবনে নেই। আপনি যদি তাকে কোনও মতে হরণ করতে পারেন, তবে তার শোকে রামের নিশ্চয় মৃত্যু হবে। আপনিও খুব সহজে একটি পরমাসুন্দরী রমণীরত্ন লাভ করতে পারবেন। এখন আপনি চিন্তা করুন কি ভাবে এই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারেন।"

দুরাচার রাবণ শূর্পণখার এই কথাগুলি অতি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন এবং নানা উপায় কল্পনা করিতে করিতে মারীচের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। মারীচ পূর্বেই বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞে রামের বিক্রম বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিল। সুতরাং রাবণকে এই কার্য হইতে বিরত করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু দুরাশয় রাবণ কোনও মতেই তাহার কথা শুনিলেন না, বরং তাহাকে নানারূপ ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বে মারীচ শুনিয়াছিল যে, পরব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণই

রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সম্প্রতি রাবণহস্তে নিধন হওয়া অপেক্ষা রামের হস্তে নিধনই শ্রেয় মনে করিয়া অগত্যা রাবণের প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং রামকে ছলনা করিবার জন্য রাবণের সহিত পঞ্চবটীতে গমন করিল।

রাবণ রথের উপরে কিছু দূরে রহিলেন। তাঁহার আদেশমতে মারীচ মায়াবলে সোনার হরিণের রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের কাছে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া সীতা বলিলেন—"আহা! কি সুন্দর হরিণটি!" পরে কৌতূহল-বশতঃ রামের নিকটে প্রার্থনা করিলেন—"নাথ! ঐ হরিণ আমাকে ধরে দিন।"

রামও সীতার মন রাখিবার জন্য লক্ষ্মণকে তাঁহার নিকটে থাকিতে আদেশ করিয়া মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মায়ামৃগও তাহা দেখিয়া অতিবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। রাম তাহার পাছে পাছে ধাবিত হইলেন। পরে বহুদূরে যাইয়া যখন বুঝিলেন যে, তাহাকে ধরিবার আর সম্ভাবনা নাই, তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রামের অব্যর্থ শর মারীচের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। তখন সে রাবণের উপদেশমতে রামের কণ্ঠধ্বনির অবিকল অনুকরণ করিয়া কাতরভাবে বার বার "ভাই রে লক্ষ্মণ!" বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল।

সেই কাতর স্বর শুনিয়া পতিপ্রাণা সীতার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ব্যাকুল হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—

"বৎস লক্ষ্মণ ! বোধ হয় আর্যপুত্র কোনওরূপ বিপদে পড়েছেন। তুমি শীঘ্র তাঁর কাছে যাও।" লক্ষ্মণ বলিলেন—"দেবি ! যিনি ভুবনবিজয়ী পরশুরামকে পরাজিত করেছেন, এই পঞ্চবটী বনে কে তাঁর বিপদ্ ঘটাতে পারে ? আমি আপনাকে একা রেখে কোনমতেই যেতে পারি না। আপনি চিন্তা করবেন না, দাদা শীঘ্রই মৃগ নিয়ে ফিরে আসছেন।"

লক্ষ্মণকে রামের উদ্দেশ্যে যাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া, সীতা দুঃখে ও ক্ষোভে তাঁহাকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সেই সকল অতি কঠিন বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা জানকীকে শূন্যগৃহে রাখিয়াই গমন করিলেন।

লক্ষ্মণ দৃষ্টির বাহির হইলে, দশানন তপস্বিবেশে সেই কুটীরের নিকটে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। যদিও জানকী তখন একান্ত আকুলচিত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তপস্বীকে ভিক্ষা না দিলে অধর্ম হইবে, এই বিবেচনায় ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। দুর্বৃত্ত রাবণ ইতস্ততঃ চাহিয়া যখন দেখিলেন যে, নিকটে আর কোনও জনমানব নাই, তখন নিঃসহায়া সীতাকে সবলে ধরিয়া রথে আরোহণ করাইলেন এবং দ্রুতবেগে রথ চালাইয়া দিলেন। সীতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার উদ্ধারের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে এবং পরে সমুদয় দেবগণকে ডাকিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অতি দূরে ছিলেন বলিয়া সীতার আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন না। দেব-

গণও ত্রিলোকবিজয়ী দুরাচার রাবণের ভয়ে সীতার কোনও সাহায্য করিতে সাহস পাইলেন না। সীতার করুণ আর্তনাদ শুনিয়া জটায়ু তাড়াতাড়ি আসিয়া রাবণের পথরোধ করিল। কিছুতে সে সীতাকে হরণ করিতে দিবে না। রাবণ তাহার উপর নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। জটায়ু তাহা সত্ত্বেও রথের গতি বন্ধ করিয়া রাখিল। অবশেষে রাবণ তাহার ডানা দুইটি কাটিয়া ফেলিল। জটায়ু মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। রাবণও এই অবসরে দ্রুতবেগে লঙ্কায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে মায়ামৃগের আচরণে, রামের মনে অতিশয় সন্দেহ জাগিল। তিনি দ্রুতবেগে কুটীরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! তুমি জানকীকে একা কুটীরে রেখে কেন এদিকে এসেছ?"

লক্ষ্মণ বিনীতভাবে সমুদয় বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাম বলিলেন—"ভাই! এই সকল ঘটনায় আমার মনে হচ্ছে যেন কুটীরে গিয়ে আর জানকীকে দেখতে পাব না।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন শূন্য কুটীর পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারা উভয়েই একান্ত আকুল হইয়া চারিদিকে খোঁজ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। উদ্‌ভ্রান্তমনে তাঁহারা বন হইতে বনে বিচরণ করিতে করিতে ছিন্নপক্ষ ও মৃতপ্রায়

রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ
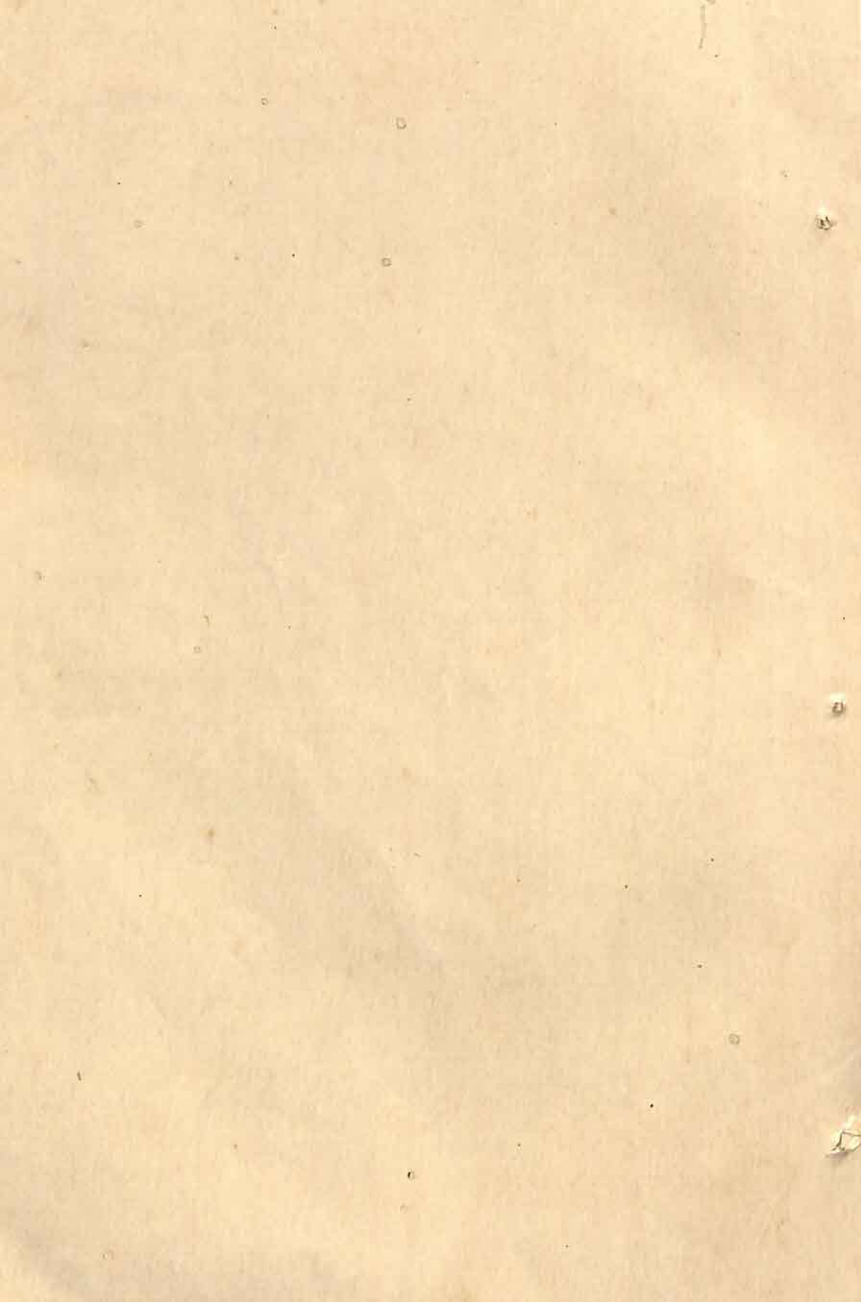
জটায়ুর নিকট উপস্থিত হইলেন। জটায়ু ক্ষীণস্বরে রামের নিকটে সীতার বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাম ও লক্ষ্মণ সেই পরম উপকারী পক্ষিরাজের মৃতদেহের অগ্নিসংস্কার করিয়া নদীজলে তাহার তর্পণ করিলেন। এইরূপে দিবা অবসান হইল; তথাপি সেই সীতাশূন্য কুটীরে ফিরিতে তাঁহাদের আর ইচ্ছা হইল না। রাত্রি হইলে তাঁহারা একটি তরুতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। কিন্তু সীতাশোকে ও চিন্তায় তাঁহাদের কাহারও চোখে সেই রাত্রিতে ক্ষণকালের জন্যও নিদ্রা আসিল না। অনেকক্ষণ নীরবে নানা চিন্তায় আকুল হইয়া রাম বলিলেন—"বৎস লক্ষ্মণ! দেখ, আমি এমনই অবোধ ও অপদার্থ যে, মিথ্যা মৃগকে প্রকৃত মৃগ মনে করে অজ্ঞান বালকের মত তাহার পিছনে ধাবিত হলাম। স্বর্ণ মৃগ যে একেবারে অসম্ভব, ও যে ইন্দ্রজাল বা মায়া ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, এ কথা একবারও আমার মনে উদিত হল না। আরও দেখ, যে নিজের একটিমাত্র স্ত্রী রক্ষা করতে পারে না, সে কেমন করে কোটি কোটি প্রজা পালন করতে পারে? তাই ভাবছি, আমার বন নির্বাসন-বিষয়ে মধ্যমা মাতার কিছুমাত্র দোষ নেই। বিধাতা আমাকে অক্ষম জেনেই তাঁর মনে এই ভাব এনে দিয়েছিলেন।"

লক্ষ্মণ বলিলেন—"দাদা, আপনার মত বীরের শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নয়। যারা কাপুরুষ তারাই শোক-দুঃখে কষ্ট পায়। আপনি দুঃখ ত্যাগ করুন। সকাল হলেই

আমরা রাবণের খোঁজে যাব। সে যেখানেই থাকুক তাকে হত্যা করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করব।"

লক্ষ্মণের সান্ত্বনা বাক্যে রাম কিছু ধৈর্য ধারণ করিলে এবং প্রতিকারে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র রাম-লক্ষ্মণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে কবন্ধ রাক্ষস তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। রাম-লক্ষ্মণ খড়্গদ্বারা তাহার বাহুদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসরূপী কবন্ধ, রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় গ্রহণ করিয়া বলিল—"আমি প্রকৃতপক্ষে রাক্ষস নই। শাপগ্রস্ত হওয়াতেই আমার এই দুর্দশা ঘটেছে। আপনারা যদি আমার অগ্নিসংস্কার করেন, তবেই আমি শাপমুক্ত হতে পারি।" রাম ও লক্ষ্মণ তাহাই করিলেন।

কবন্ধ নিজের মনোহর পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে একটি পথ দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বলিল—"এই পথে কিছুদূর গেলেই আপনারা মহাতপা মতঙ্গ মুনির পরম রমণীয় তপোবন ও পম্পানামক মনোহর সরোবর দেখতে পাবেন। ঐ সরোবরের অতি নিকটেই ঋষ্যমূক পর্বত। তাহাতে সুগ্রীব প্রভৃতি কতিপয় বানররাজ বাস করছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হলেই কার্যসিদ্ধি হবে।" এই বলিয়া শাপমুক্ত দানব আপনার গৃহে প্রস্থান করিল।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

রাম ও লক্ষ্মণ সেই পথে চলিতে চলিতে, ঋষ্যমূক পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সুগ্রীব প্রভৃতি পর্বতনিবাসী বানরগণ রাম-লক্ষ্মণের মনোহর আকৃতি, রাজলক্ষণ ও বীরলক্ষণ দেখিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল এবং তাঁহাদের ঋষ্যমূকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। রাম আপনাদের পরিচয় দিয়া, যে কারণে তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাও বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া সুগ্রীব বলিল—"হে রঘুনন্দন! আপনার দর্শন লাভে আমি খুব সুখী হয়েছি। আমার আশা হচ্ছে যে, আপনার অনুগ্রহে আমার সমুদয় দুঃখ দূর হবে। আপনি যেমন স্ত্রীর দুঃখে ব্যাকুল হয়েছেন, আমিও তেমনই আমার স্ত্রীকে হারিয়ে মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছি। আমার বড় ভাই বালী বলবান ও দুষ্ট স্বভাবের লোক। তিনি নিষ্ঠুরের মত আমাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার স্ত্রী রুমাকে বলপূর্বক বন্দী করে রাখলেন।"

ইহা শুনিয়া রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালী তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তবে তোমাদের মধ্যে এরূপ শত্রুতা জন্মিল কেন?"

সুগ্রীব বলিল—"মহাশয়! আমার পিতার পরলোক-গমনের পর, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর বালীই রাজপদ লাভ করলেন। আমি ভৃত্যের ন্যায় তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলাম।

"একদা মায়াবী নামক এক পরাক্রান্ত মানব কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করল। জ্যেষ্ঠের সঙ্গে আমিও যুদ্ধের জন্য বার হলাম। তখন আমাদের দুই জনকে দেখে মায়াবী ভয়ে পালিয়ে এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করল; বালীও তার অনুসরণ করে গুহামধ্যে প্রবেশ করলেন। প্রবেশকালে তিনি আমাকে বলে গেলেন যে, 'আমার আগমন পর্যন্ত এই বিল-দ্বারেই অবস্থান কর, অন্য কোথাও যেও না।'

"পরে বহু দিন গত হলেও তিনি আর প্রত্যাবর্তন করলেন না। সুতরাং তিনি নিহত হয়েছেন মনে করে, আমি দানবের ভয়ে সুবৃহৎ এক পাষাণ-খণ্ডদ্বারা বিলমুখ রুদ্ধ করলাম এবং হতাশচিত্তে নগরে প্রত্যাবর্তন করলাম। অনন্তর মন্ত্রিগণ আমাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করল; আমিও অগত্যা প্রজা-পালনে প্রবৃত্ত হলাম।

"বহুকাল পরে মায়াবীকে হত্যা করে বালী বিলদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সেই দ্বার পাষাণে রুদ্ধ করা আছে। নিজের বাহুবলে সেই পাথর সরিয়ে দিয়ে তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় এলেন। তখন আমি গিয়ে তাঁকে প্রকৃত কথা নিবেদন করে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু তিনি মিথ্যা সন্দেহে আমাকে ক্ষমা না করে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। আমি তখন প্রাণভয়ে ঋষ্যমূক নামক স্থানে আশ্রয় নিলাম। মতঙ্গ মুনির শাপের ভয়ে এই পর্বতে তিনি আর আসতে পারলেন না।"

রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাতপা মতঙ্গমুনি কি কারণে বালীকে কি অভিসম্পাত করেছিলেন ?"

সুগ্রীব বলিল—"দুন্দুভিনামে এক মহিষাসুর বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলে, তিনি বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করে তাকে বিনাশ করলেন। পরে বাহুবলের মত্ততায় তার মৃতদেহ দুই ক্রোশ দূরে ঋষ্যমূক পর্বতে নিক্ষেপ করলেন। দুন্দুভির মুখ ও নাসারন্ধ্র হতে রক্তবিন্দু সকল চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে মহামুনি মতঙ্গের আশ্রমে নিপতিত হ'ল। তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিসম্পাত করলেন, 'যে দুরাচার আমার আশ্রমকে অপবিত্র করেছে, আমার আশ্রমের ত্রিসীমায় আসামাত্রই তার শিরশ্ছেদ হবে।' এই শাপসংবাদ শ্রবণ করে, বালী আর কখনও এখানে আসেন না।"

সুগ্রীবের এই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া দয়ালুহৃদয় রামচন্দ্র নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং অচিরেই বালীকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুগ্রীবও একান্ত অনুগৃহীত হইয়া নিবেদন করিল—"আমি চিরজীবনের জন্য আপনার দাস হলাম ; আপনি যখন যা আদেশ করবেন, তখনই তা প্রাণপণে সম্পাদন করব।"

পরে উভয়েই অগ্নিসাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিলেন। হনুমানও সুগ্রীবের পথ অনুসরণ করিয়া ভক্তিভরে আপন হইতেই রামচন্দ্রের দাসত্ব স্বীকার করিল।

রাম সুগ্রীবকে বলিলেন—"মিত্র ! তুমি এখনই গিয়ে বালীর

সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; আমি দূর হতে একটি বাণেই তাকে সংহার করছি।”

সুগ্রীব বলিল—“আপনি বালীর বিক্রম কিছুই অবগত নন, আমি তাঁর বিক্রম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করেছি; সুতরাং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার আর কোনও মতেই সাহস হচ্ছে না। এই যে, সম্মুখে দুন্দুভির পর্বতাকার দেহ ও পত্রহীন সাতটি শাল বৃক্ষ দেখছেন, এসকলই তাঁর ভুজবলের নিদর্শন।”

রাম সুগ্রীবের কথা শুনিবার পর তাহাকে নিজের শক্তি দেখাইবার জন্য পায়ের আঙ্গুল দিয়া দুন্দুভির মৃতদেহ দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং একটি বাণের আঘাতে সাতটি শালগাছ ভেদ করিলেন। এই অসামান্য শক্তি দেখিয়া সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

অনন্তর সুগ্রীব, রামের কথামত যাইয়া বালীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাম দেখিলেন বালী ও সুগ্রীবের আকৃতিতে কোনই বিভিন্নতা নাই, সুতরাং সুগ্রীবের জীবননাশের আশঙ্কায় তখন আর বাণ নিক্ষেপ করিলেন না। এদিকে সুগ্রীব বালীর প্রহারে একান্ত কাতর হইয়া অগত্যা ঋষ্যমূকে পলায়ন করিল এবং নিকটে যাইয়া অতি কাতরভাবে রামচন্দ্রকে বলিল—“হে রঘুনন্দন! অনুগত ব্যক্তির প্রতি এরূপ নির্দয় আচরণ কি আপনার মত মহাবীরের উচিত?”

রাম তাহাকে মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, প্রকৃত কথা

বুঝাইয়া দিলেন এবং পুষ্পমাল্যদ্বারা তাহাকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

প্রাসাদদ্বারে পুনরায় সুগ্রীবের গর্জন শুনিয়া বালী যুদ্ধগমনে উদ্যত হইলে তাহার বুদ্ধিমতী স্ত্রী তারা বিনয়ের সহিত বলিল —"নাথ! আমি অনেক আগেই শুনেছি স্বয়ং বিষ্ণু রাজা দশরথের ঘরে রামরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহায় হয়েছেন। আপনি এখনি সুগ্রীবের স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করুন। আর যুদ্ধে প্রয়োজন নেই।"

বুদ্ধিমতী তারার এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়াও বালী নিবৃত্ত হইল না; অবিলম্বে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, ইতিমধ্যে সহসা বনমধ্য হইতে একটি বাণ আসিয়া বালীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। বালী তৎক্ষণাৎ ভীষণ চীৎকার করিয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, তারার সকল কথাই সত্য। কিছুকাল পরে নবদূর্বা-দলশ্যাম রাম তাহার নয়নপথে উদিত হইলেন। তখন বালী বলিল—"আমি পূর্বেই তোমার বিষয় অবগত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় বীর হয়েও, এমন অন্যায়রূপে আমাকে বিনাশ করবে এ আমি কখনই মনে করতে পারিনি। ওহে ক্ষত্রিয়বীর! এই কি তোমার বীরধর্ম?"

রাম বলিলেন—"হে বানররাজ! তুমি ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব কি বুঝবে? তুমি নিজের শক্তিগর্বে অন্ধ হয়ে যেসব অন্যায়

কাজ করেছ তা কোন ধার্মিক লোকই অনুমোদন করতে পারেন না। তুমি বিনা দোষে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নির্বাসিত করেছ। শুধু তাই নয়—তার ধর্ম-পত্নীকে পর্যন্ত তুমি বলপূর্বক অন্যায়রূপে গ্রহণ করেছ! তোমার মত পাপীর বেশী দিন বেঁচে থাকা ঠিক নয়, তাতে সংসারের অনিষ্ট হয়। আমরা ক্ষত্রিয়, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন আমাদের কর্তব্য কর্ম, আমি সেই কাজই করেছি। যে কোনও উপায়ে দুষ্টকে বধ করা অধর্ম নয়। ধর্মকে রক্ষা করতে বীরমাত্রই এ কাজ করে থাকে। ভেবে দেখ, তুমি নিজের পাপেই নিজে বিনষ্ট হয়েছ, আমি উপলক্ষমাত্র।”

বালী আর কোন কথা বলিতে পারিল না; রামবাক্য শুনিতে শুনিতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ইতিমধ্যেই এই সংবাদ কিষ্কিন্ধ্যার সর্বত্র প্রচারিত হইল। তারা প্রভৃতি বালী-পত্নীগণ ও বালীপুত্র অঙ্গদ আসিয়া মহাকোলাহলে রোদন করিতে লাগিল। দয়ালু-হৃদয় রাম তাহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সুগ্রীবকে বলিলেন—“সখে সুগ্রীব! এখন রোদন করবার সময় নয়। এখন যথাবিধানে বালীর অগ্নিসংস্কার কর। আর আমি অনুরোধ করছি যে, এখন বালীপুত্র অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে স্বয়ং রাজা হয়ে প্রজা-পালনে তৎপর হও।”

সুগ্রীব রামের আদেশ মতে সকল কার্য নির্বাহ করিয়া রামকে বলিল—“মিত্র! এখন বর্ষাকাল সমাগত। আপনি কিছুকাল আমাদের রাজধানীতে অবস্থান করুন. বর্ষাপ্রভাতে

আমরা জানকীর উদ্ধারের জন্য বার হ'ব। আমি নানা দেশবাসী ও নানা পর্বতবাসী বানর ও ভল্লুকগণকে সংবাদ দিয়ে একত্রিত করে রাখছি।"

রাম বলিলেন—"আমি পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসে এসেছি। রাজধানীর বিলাসের মধ্যে থাকলে আমার সে সত্য পালন হবে না। আমি এই বনেই থাকব। তুমি এই কয়েক মাসের মধ্যে সীতা উদ্ধারের সমস্ত আয়োজন করে রাখ।"

সুগ্রীব রামের বাক্য শিরোধার্য করিয়া রাজধানীতে গমন করিল। সুগ্রীবের আদেশে পৃথিবীর সমস্ত বানর ও ভল্লুক আসিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় সমবেত হইল।

সুন্দরকাণ্ড

বর্ষা শেষ হইবার পর রাম-লক্ষ্মণ বানর সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া রাবণের বাসস্থান খুঁজিতে বাহির হইলেন। পথের মধ্যে তাঁহাদের সহিত জটায়ুর ভাই পক্ষীরাজ সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহার মুখ হইতে তাঁহারা শুনিলেন,—সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কাদ্বীপে রাবণের বাসস্থান। সুতরাং তাঁহারা সমুদ্রতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

রাবণের শক্তি কিরূপ এবং সীতা কোথায় কি ভাবে আছেন তাহা জানিবার জন্য রাম-লক্ষ্মণ দূত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান জাম্ববান বলিল—"একমাত্র পবননন্দন হনুমান এই কাজ করতে পারেন।" সকলে ইহাতে স্বীকার করিলে সুগ্রীব হনুমানকে লঙ্কায় যাইতে আদেশ দিল।

মহাবল হনুমান, রাজার আদেশ ও রামের কার্যবিবেচনায়, অতি উল্লাসের সহিত এক লম্ফেই সাগর পার হইয়া লঙ্কায় অবতীর্ণ হইল। পরে ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়া, রাত্রে লঙ্কার নানাস্থানে পর্যটন করিতে লাগিল। সে দেখিল, গৃহে গৃহে সকলেই নিদ্রিত।

অবশেষে হনুমান অশোক বনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেখানে শিংশপা গাছের তলায় মলিনবেশা এক পরমাসুন্দরী কাঁদিতেছেন। তিনি মাঝে মাঝে রাম ও লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। সেই সুন্দরীকে

অনেকগুলি ভীষণা রাক্ষসী ঘেরিয়া বসিয়া আছে। রাক্ষসীগণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে বলিতেছে—"তুমি শীঘ্র রাবণের অনুগত হও, তা না হলে তোমাকে যন্ত্রণা দেওয়া হবে।"

হনুমান বুঝিতে পারিল, এই দেবীমূর্তিই সীতা।

শেষে চেড়ীগণ ক্রমে ক্রমে নিদ্রিত হইলে, হনুমান বৃক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া বিনীতভাবে সীতাকে প্রণাম করিল এবং রাম-লক্ষ্মণ যে সুগ্রীব-প্রভৃতিকে সহায় করিয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য লঙ্কার অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—তৎসমুদয় নিবেদন করিল।

সীতা, প্রথমতঃ রাক্ষসের মায়া মনে করিয়া হনুমানের প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। পরে যখন হনুমান রামদত্ত অঙ্গুরীয় সীতার হস্তে প্রদান করিল, তখন তাঁহার মৃতপ্রায় দেহে যেন জীবনসঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—"হে কপিবর! তুমি যেরূপ গোপনে এখানে এসেছ, তেমনি গোপনেই শীঘ্র রামের নিকট যাও, আমি আশীর্বাদ করছি, পথে যেন তোমার কোনও বিপদ্ না ঘটে। আমার এই অঙ্গুরীয়টি আর্যপুত্রকে দিও এবং বলো যে, আমি কেবল তাঁর চরণ দর্শনের আশায় এতদিন জীবিত রয়েছি।"

হনুমান সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গমন করিতে করিতে দেখিল, একটি উদ্যানে নানাবিধ সুখাদ্য ফল পাকিয়া রহিয়াছে। অমনি সে উদ্যানে প্রবেশ করিল। রাক্ষসগণ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। হনুমান তাহাদের সকলকে বিনাশ

করিয়া ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। এই সংবাদ শুনিয়া রাবণপুত্র অক্ষয়কুমার সেখানে উপস্থিত হইল এবং তীক্ষ্নবাণে হনুমানের শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল। হনুমান মুহূর্তকাল মধ্যে তাহাকেও নিধন করিল। পরে বীরশ্রেষ্ঠ রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাবণের কাছে লইয়া গেল। হনুমান ছল করিয়া মৃতবৎ ভূমিতে পড়িয়া রহিল।

রাবণ রাক্ষসগণকে আদেশ করিলেন—"শীঘ্র এই বানরটাকে পুড়িয়ে ফেল।" সেই কথা শুনিয়া রাক্ষসগণ তাহার বাঁধন খুলিয়া লেজে আগুন ধরাইয়া দিল। হনুমান তখন লাফে লাফে এক গৃহ হইতে আর এক গৃহে যাইয়া চতুর্দিকে আগুন ধরাইয়া দিল। এইরূপে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া একলাফে সে সমুদ্রে পড়িল এবং আর একলাফে সাগর পার হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল।

হনুমানের মুখে সীতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাম কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন এবং কিরূপে শীঘ্রই সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে সমুদ্র পার হইতে হইবে, ইহাই সকলের প্রথম চিন্তা হইল। বৃদ্ধ ও বহুদর্শী জাম্ববান কহিল—"আমাদের মধ্যে নলনামক যে সেনাপতি আছে, সে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুত্র; তার শিল্প-নৈপুণ্যও প্রায় জনকের তুল্যই। বিশেষতঃ বিশ্বকর্মা তাকে এই বরও দিয়েছেন যে, নল যে পাষাণ স্পর্শ করবে, তাই লঘু হয়ে জলে ভাসবে। অতএব তাকেই সমুদ্রের উপরে একটি সেতু নির্মাণে নিযুক্ত করা যাক।"

জাম্ববানের এই সৎপরামর্শে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। সুগ্রীবের আদেশে বানরগণ পৃথিবীর নানা পর্বত হইতে বৃহৎ বৃহৎ পাষাণখণ্ড আনিয়া সমুদ্রের তীরে রাশীকৃত করিতে লাগিল। পরে নল সেই সকল প্রস্তর দ্বারা সুবৃহৎ এক সেতু নির্মাণ করিল। অঙ্গদ প্রভৃতি বড় বড় বানরগণ সেই সেতুর উপরে উঠিয়া যথাশক্তি তাহাতে পদাঘাত ও লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া উহার শক্তির পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই সেই সেতু একটুও বিচলিত হইল না। তখন সকলেই নলের অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

এদিকে রাবণ শুনিলেন যে, রামচন্দ্র সুগ্রীব প্রভৃতিকে লইয়া সাগরের অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনিও আর স্থির না থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

এই সময় রাবণের কনিষ্ঠ ভাই ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বিভীষণ অতি বিনীতভাবে রাবণকে বলিলেন—"মহারাজ! রামচন্দ্র সামান্য মানুষ নন। তিনি স্বয়ং ভগবান, রাজা দশরথের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাড়কাকে বধ, হরধনুর্ভঙ্গ ও মারীচ, খরদূষণ এবং বালীর নিধনই তাঁর যথেষ্ট বিক্রমের পরিচয় দিয়েছে। সেই জন্যে প্রার্থনা করি, শীঘ্র সীতাকে ফিরিয়ে দিন। যুদ্ধের আয়োজনের কোনও দরকার নেই। যুদ্ধের আয়োজন করলে আমাদের সবংশে নিধন হতে হবে।"

বিভীষণের মুখে শত্রুর প্রশংসা ও নিজের অমঙ্গলের কথা

শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং বিভীষণকে পদাঘাত করিয়া নিতান্ত কর্কশবাক্যে তিরস্কারপূর্বক সভা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বিভীষণ আর কোনও উপায় না দেখিয়া অবিলম্বে রামের শরণাগত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলেন এবং রাবণকে নিধন করিয়া তাঁহাকে লঙ্কার রাজা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সুগ্রীবাদি প্রধান প্রধান বানরগণ নির্জনে রামচন্দ্রকে কহিল—"প্রভো! বিভীষণ বিশ্বাসের পাত্র কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

রাম বলিলেন—"শরণাগত শত্রুকেও রক্ষা করতে হবে, ইহাই চিরপ্রচলিত সাধু নীতি। বিশেষতঃ শত্রু-সহোদর বলে বিভীষণকে শত্রু মনে করতে আমার ইচ্ছা হয় না; তাঁর মধুর আকৃতি দেখে ও সরলতাপূর্ণ কথা শুনে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে যে, তাঁর হৃদয়ও তেমনই মধুর ও সরল। যদি তিনি কপটাচারী হন, তথাপি যখন আশ্রয় নিয়েছেন এবং আমিও তাঁকে অভয়দান করেছি, তখন আর কোনও মতেই তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারি না।"

রামের এইরূপ দৃঢ়তা দর্শন করিয়া সুগ্রীব প্রভৃতি আর কোনও কথা বলিল না।

লঙ্কাকাণ্ড

রাক্ষসগণ লঙ্কার প্রাচীরে উঠিয়া সেতুসন্দর্শনে বিস্মিত ও ভীত হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"পাষাণ জলে ভাসে, একথা কখনও শুনি নি, এখন তা চোখেই দেখছি। জানি না, এবার লঙ্কার ভাগ্যে কি আছে?" রাক্ষসেরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, ইতিমধ্যেই বানরগণ "জয় রাম" শব্দে লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে বানরবৃন্দ লঙ্কার চারিধার বেষ্টন করিয়া বাহির হইবার সকল পথ অবরুদ্ধ করিল।

রাবণ যখন শুনিলেন যে, সাগরে সেতুবন্ধন করিয়া বানরসৈন্য লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাঁহার সেই পাষাণ-হৃদয়ও কিছুকালের জন্য কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শুক ও সারণ নামক দুই জন মন্ত্রীকে বলিলেন—"তোমরা গুপ্তভাবে বানর-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে তাদের বল ও বিক্রমের বিষয় জেনে এস।"

তাহারা রাজার আদেশে বানররূপ ধারণ করিয়া, রাম-সৈন্যমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। বিভীষণ তাহাদের মায়া বুঝিতে পারিয়া বানরগণের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। বানরগণ তাহাদিগকে ধরিয়া প্রহার করিতে করিতে রামের নিকটে লইয়া গেল। তাহারা প্রাণভয়ে আকুল হইয়া কহিতে লাগিল—"আমরা দূত; সুতরাং অবধ্য।"

রামচন্দ্র বানরদিগকে নিবারণ করিয়া, বানররূপী শুক ও সারণকে বলিলেন—“তোমাদের কোনও ভয় নেই। দূত না হলেও তোমরা যখন নিরস্ত্র, তখনই অবধ্য। হে দূতগণ! তোমরা যা জানতে এসেছ, যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে তা জেনে যাও; আমি অভয় প্রদান করলাম, এখন আর তোমাদিগকে কেউ কিছু বলবে না।”

দূত দুইজন রামের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া রাবণের নিকট গমন করিল এবং যাহা দেখিয়াছিল ও যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় তাঁহার নিকটে নিবেদন করিল। তখন রাক্ষসরাজ আপনার বীরপুত্র মেঘনাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—“আমি বিপক্ষের শক্তি জানবার এবং সুগ্রীবাদির সহিত রামের ভেদ জন্মাবার উদ্দেশ্যে, যে সকল উপায় অবলম্বন করেছিলাম, সে সকলই বিফল হয়েছে। কুলাঙ্গার বিভীষণ বিপক্ষপক্ষে সম্মিলিত হয়েছে। এখন প্রথম যুদ্ধে কাকে প্রেরণ করা কর্তব্য, তাই স্থির কর।”

মেঘনাদ পিতার বাক্য শুনিয়া বীরগর্বে বলিল—“আর কাকেও যুদ্ধে পাঠাবার প্রয়োজন নেই; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখনই যুদ্ধে গিয়ে, রাম-লক্ষ্মণের সহিত সমুদয় বানরকুল নির্মূল করে আসছি।” ইন্দ্রজিতের কথা শুনিয়া দশানন তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধের জন্য বাহির হইলে রাবণ মায়াবলে রাম ও লক্ষ্মণের ছিন্ন মুণ্ড নির্মাণ করিয়া সীতাকে দেখাইলেন।

বলিলেন—"এই দেখ রাম ও লক্ষ্মণ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নিহত হয়েছে। এই দেখ, তাদের মাথা কেটে এনেছি। এখন তোমার আমার স্ত্রী হতে আপত্তি কি ?"

সেই ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া সীতা অত্যধিক শোকাবেগে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

বিভীষণের স্ত্রী সরমা সীতার এই অবস্থার কথা শুনিয়া অতি গোপনে আসিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন—"দেবি! ইহার কিছুই সত্য নহে, সকলই ছলনামাত্র।"

এই সময়ে অদূরে রাক্ষস ও বানরগণের ভয়ানক রণকোলাহল হইতেছিল ; সরমা সীতাকে তাহা শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া সীতা একটু আশ্বস্তা হইলেন।

এদিকে বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ সম্মুখসমরে রামের বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া মেঘে লুক্কায়িত হইল এবং তথা হইতে অলক্ষিতরূপে নাগপাশে রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করিয়া অবিরলধারে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাতে রাম-সৈন্য জর্জরিত-কলেবরে অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইন্দ্রজিৎ উল্লাসের সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া রাবণকে সমুদয় নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া রাবণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিলেন। লঙ্কাপুরী আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

রাবণের আদেশে ত্রিজটা রাক্ষসী সীতাকে পুষ্পক রথে

আরোহণ করাইয়া রণস্থলে পতিত রাম-লক্ষ্মণকে দেখাইল। পতিপ্রাণা সীতা তাহা দেখিয়া আবার মূর্ছিতা হইলেন। বহু যত্নেও ত্রিজটা তাঁহার চৈতন্যের সঞ্চার করিতে পারিল না, অগত্যা অশোকবনে সেই শিংশপাতরুতলে নিয়া শয়ন করাইয়া রাখিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বানরগণ ও রাম-লক্ষ্মণ চেতনা লাভ করিলে, বানরগণের কোলাহল-শব্দ সীতাদেবীর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। তিনি আবার "হা রাম, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সরমা আসিয়া প্রকৃত কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

রামচন্দ্র চৈতন্যলাভ করিয়া পক্ষিরাজ গরুড়কে আহ্বান করিলেন। গরুড় আসিতে নাগেরা চতুর্দিকে পলায়ন করিল। রাম-লক্ষ্মণ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলেন। বানরগণ আবার আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

ইহার পর রাবণ-সেনাপতি ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন ও প্রহস্ত একে একে আসিয়া কিছুদিন তুমুল যূদ্ধ করিল। পরে হনুমানের হাতে ধূম্রাক্ষ ও অকম্পন, অঙ্গদের হাতে বজ্রদংষ্ট্র ও নীলের হস্তে প্রহস্ত নিহত হইল। সেনাপতিদের নিধন-বার্তা শুনিয়া রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিলেন।

রাবণের বাণবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া বানরগণ দলে দলে পলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ অগ্রবর্তী হইলেন এবং রাবণের সহিত বহুকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহার

শেলাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন। রাবণ বহু যত্ন করিয়াও লক্ষ্মণকে রথে তুলিয়া লইতে পারিলেন না। ইত্যবসরে রাম আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ রামের তীক্ষ্ণ শরজাল সহ্য করিতে না পারিয়া রথ ফিরাইলেন। রাম পরাঙ্মুখ যোদ্ধার শরীরে আর অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণও চৈতন্য লাভ করিলেন। বানরগণ রাবণকে উপহাস করিতে লাগিল।

রামের শরাঘাতে ও বানরগণের উপহাসে রাবণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাই অবিলম্বে শত্রু-বিনাশের জন্য বহু যত্নে কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিলেন। কুম্ভকর্ণও নর-বানরের মাংসলোভে সত্বরই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। তাহার পর্বতপ্রমাণ ভয়ানক শরীর দেখিয়া বানরগণ মহাভীত হইল এবং রুদ্ধশ্বাসে ইতস্ততঃ পলাইতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মিত্র! এই যে প্রকাণ্ড-শরীর বীরপুরুষ আসছে, এর নাম কি?"

বিভীষণ বলিলেন—"ইনি আমার মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। এঁর অত্যাচারে পাছে পৃথিবী জনশূন্য হয়, এই ভয়ে বিধাতা বিধান করেছেন যে, ইনি ছয় মাস নিদ্রিত থেকে একদিন মাত্র জাগরিত হবেন। আর এও নির্ধারিত করেছেন যে, কোনও কারণে ছয় মাসের আগে জাগরিত হলে, সেই দিনেই এঁর মৃত্যু ঘটবে। বিধাতা আপনার প্রতি একান্ত অনুকূল, তাই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য রাজা আজ এঁকে অকালে জাগরিত করেছেন। আজ অবশ্যই এঁর মৃত্যু হবে।"

কুম্ভকর্ণের নিকট যে আসিতেছে সেই তার উদরে চলিয়া যাইতেছে। এত বড় রাক্ষস আর কেহ কোন দিন দেখে নাই। বানর ভক্ষণ যেন তাহার শেষ হইতে চায় না। সমস্ত বানর পাছে খাইয়া ফেলে এই আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্র এক সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

রাবণ লঙ্কায় বসিয়া মনে মনে বড়ই আশা করিতেছিলেন যে, কুম্ভকর্ণ বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে; এমন সময় দূত যাইয়া কুম্ভকর্ণের নিধন-বার্তা জ্ঞাপন করিল। রাবণ হতাশহৃদয়ে হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অতঃপর দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা, মহোদর ও মহাপার্শ্ব-নামা পাঁচজন বীর একে একে যুদ্ধে গমন করিল। বহুকাল যুদ্ধের পর হনুমানের হস্তে দেবান্তক ও ত্রিশিরা, অঙ্গদের হস্তে নরান্তক, নীলের হস্তে মহোদর এবং ঋষভের হস্তে মহাপার্শ্ব নিহত হইল।

অনন্তর মহাবল অতিকায় রণে প্রবেশ করিল। তাহার প্রকাণ্ড শরীর দর্শন করিয়া বানরগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাতে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া অতিকায়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল যুদ্ধের পর লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া অতিকায়কে বিনাশ করিলেন।

অতঃপর ইন্দ্রজিৎ দ্বিতীয় বার যুদ্ধে গমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সকলকে অচেতন ও ভূতলে পতিত করিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাবণের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। লঙ্কাপুরীও আবার আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল।

অচিরেই বানরসৈন্যগণের সহিত রাম-লক্ষ্মণ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। পরে কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভ যুদ্ধে উপস্থিত হইল। বহুকাল যুদ্ধের পর সুগ্রীব কুম্ভকে এবং হনুমান নিকুম্ভকে বিনাশ করিল। অনন্তর খরপুত্র মকরাক্ষ যুদ্ধে সমাগত হইলে রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে তাহার বিনাশ সাধন করিলেন।

তাহার পর তরণীসেন ও বীরবাহুর সহিত দুই দিন অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই দুই যুদ্ধে উভয়পক্ষেরই বহুলপরিমাণে বলক্ষয় ঘটিল। পরে রামচন্দ্র উভয়কেই সুতীক্ষ্ণ বাণাঘাতে বিনাশ করিলেন।

ইহার পরে ইন্দ্রজিৎ এক মায়াসীতা নির্মাণ করিয়া, তাহাকে লইয়া রণস্থলে উপনীত হইল এবং বানরগণের সমক্ষে খড়গদ্বারা তাহার শির ছেদন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া বানরগণ হাহাকার করিতে লাগিল। রাম-লক্ষ্মণও ইহা শ্রবণ করিয়া শোকে-দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। তখন বিভীষণ সান্ত্বনাবাক্যে রামচন্দ্রকে বলিলেন—"এ কিছুই নয়। ইন্দ্রজিৎ আপনাদিগকে শোকে অভিভূত রেখে নির্বিঘ্নে নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ করবার জন্য এই ছলনা করেছে। যদি সে এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে যুদ্ধে আগমন করতে পারে, তবে আর এবার কারও নিস্তার থাকবে না। অতএব এই সময়েই তাকে বিনাশ করা উচিত।"

বিভীষণের এই বাক্য যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, লক্ষ্মণ রামের অনুমতি লইয়া, বিভীষণ ও কতিপয় প্রধান প্রধান বানরের সহিত হঠাৎ নিকুম্ভিলা-যজ্ঞালয়ে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ

যজ্ঞসমাপনের আর অবসর পাইল না। অগত্যা তখনই তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কিছুকাল ঘোর যুদ্ধের পর, লক্ষ্মণ এমন এক সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহাতেই ইন্দ্রজিতের মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। রাক্ষসদলে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল।

ইন্দ্রজিতের নিধন-বার্তা শ্রবণে রাবণ শোকাকুল হইয়া বহুক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করিলেন। পরে যখন শুনিলেন, বিভীষণের মন্ত্রণানুসারেই লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে অসময়ে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিয়াছে, তখন এই দুইজনের প্রতিই তাঁহার অপরিসীম ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি অবিলম্বে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া বানরসৈন্য দলন করিতে করিতে বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া রথ চালাইলেন। রাবণের তীক্ষ্ণবাণে জর্জরিত হইয়া বানরগণের মধ্যে কেহই তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না।

বিভীষণকে একবারে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় রাবণ, অতি ক্রোধভরে এক অব্যর্থ শক্তিশেল গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে লক্ষ্মণ, বিভীষণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অতি লঘুহস্তে রাবণের উপর তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণ একান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া হাতের সেই শক্তিশেল লক্ষ্মণের উপরই নিক্ষেপ করিলেন। সেই শেলাঘাতেই লক্ষ্মণ অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বানরসৈন্যদলে হাহাকার উঠিল। অবিলম্বে রামচন্দ্র আসিয়া রাবণকে আক্রমণ করিলেন; রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া লঙ্কায় ফিরিয়া গেলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বক্ষ হইতে শেল উৎপাটন করিলেন; কিন্তু বহু যত্ন করিয়াও তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। ভ্রাতৃশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া রামচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং প্রাণবিসর্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এদিকে জাম্বুবান, সুষেণ প্রভৃতি বহুদর্শী বানরগণ লক্ষ্মণের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। অনন্তর তাহাদের ব্যবস্থামতে রামভক্ত হনুমান, গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশল্যকরণী ঔষধি আনিবার জন্য অবিলম্বে প্রস্থান করিল; কিন্তু বিশল্যকরণী চিনিতে না পারিয়া অগত্যা পর্বতই মাথায় করিয়া লইয়া আসিল! তখন সুষেণ সেই ঔষধি বাছিয়া লইয়া তাহার রস লক্ষ্মণের নাসিকা-রন্ধ্রে ও মুখে অর্পণ করিল। রামও আপনাকে পুনর্জীবিত মনে করিলেন। বানরগণও "জয় রাম" শব্দে আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিল।

অনন্তর সমুদয় সৈন্য সঙ্গে করিয়া রাবণ শেষবার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। এদিকে রামচন্দ্রও নিজ সৈন্যের অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম ও রাবণে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যে সকল অস্ত্রবলে রাবণ এক সময়ে ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলেন, সেই সমুদয় বাণ তিনি একে একে প্রয়োগ করিয়া নিঃশেষ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রামচন্দ্রকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। রাবণের সমুদয় বাণ বিফল করিয়া রামচন্দ্র নিরন্তর শরপাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ করিতে

লাগিলেন। এইরূপে বহুদিন অবিশ্রামে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ আশ্রয় করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মর্ত্যে বানর ও রাক্ষসগণ এবং বিমানে দেববৃন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রাম-রাবণের এই ঘোরতর যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। দশাননের এক একটি মস্তক রামবাণে ছিন্ন হইলেও পুনঃ সংযোজিত হইতে লাগিল। অনন্তর রামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া একবারেই রাবণের দশটি মুণ্ড ছেদন করিলেন। এবার আর সেই ছিন্ন মস্তকগুলি স্কন্ধে পুনঃ সংলগ্ন হইল না; রাবণ নিহত হইলেন। বানরগণ "জয় জয়" নাদে আকাশ-পাতাল নিনাদিত করিল। রাক্ষসগণ হাহাকার করিতে লাগিল।

অতঃপর রামের আদেশে বিভীষণ জ্ঞাতিবর্গের সৎকারাদি কার্য নির্বাহ করিয়া লঙ্কার রাজা হইলেন। তিনি, নিজপত্নী সরমাদ্বারা সীতাকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাম-সমীপে লইয়া গেলেন, কিন্তু রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে সীতাকে স্ত্রীরূপে পুনরায় গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সীতা তাহাতে একান্ত দুঃখিতা হইয়া অগ্নিকুণ্ডে শরীর বিসর্জন করিলেন। কিন্তু ধর্মের কি আশ্চর্য প্রভাব! অগ্নিতে সতী পতিব্রতা সীতার শরীর একটুও দগ্ধ হইল না।

এই সময় দেবগণ আসিয়া রামকে বলিলেন—"তুমি মিথ্যা আশঙ্কা করছ। সীতা একান্ত পতিপ্রাণা ও সাধুশীলা। এই দেখ, অগ্নি তাঁকে স্পর্শও করতে পারে নি।"

সকলেই দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, অগ্নি আপনা হইতেই নির্বাণ লাভ করিয়াছে, সীতার বস্ত্রের একটি সূত্রও দগ্ধ হয় নাই। অনন্তর দেবগণের বাক্যে রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন। রাক্ষস ও বানরগণ তাহাতে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দেবগণও রামের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রার্থনামতে রণক্ষেত্রে নিহত বানরগণকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিলেন।

উত্তরকাণ্ড

এইরূপে দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর পার হইল। রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালন পূর্ণ হইয়াছে। সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পক রথে উঠিয়া অযোধ্যার দিকে চলিলেন। সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণ এবং বিভীষণ তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

তাঁহারা ক্রমে সাগর, কিষ্কিন্ধ্যা, পঞ্চবটী ও চিত্রকূট পর্বত এবং মুনিগণের আশ্রমসমূহ দেখিতে দেখিতে এক দিনেই নন্দিগ্রামে যাইয়া উপনীত হইলেন। রাজবেশের পরিবর্তে ভরতের জটাবল্কল-ধারণ অবলোকন করিয়া সকলেই একান্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ভরতের জটাবিভূষিত মস্তক ভক্তিভরে রামচরণে অবনত হইল। রামচন্দ্র ভরতের পবিত্র দেহে স্নেহাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পর স্নেহ-সম্ভাষণের পরে তাঁহারা সকলে মিলিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। বহুকাল পরে রামচন্দ্র প্রভৃতিকে পুনরায় দর্শন করিয়া রাজমহিষীগণ ও অযোধ্যা-বাসী প্রজাবর্গ যেন হাতে আকাশ পাইলেন। অযোধ্যা নগরী আবার আনন্দোৎসব পরিপূর্ণ হইল।

এক শুভদিনে সকলের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে রামচন্দ্র রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভরতকে

তিনি যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন। কিছুদিন উৎসবে অতিবাহিত হইবার পর রামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণকে নিজ নিজ রাজ্যে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। তাঁহারাও রামচন্দ্রের উপদেশ অনুসারে নিজরাজ্যে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

এতদিন রাক্ষসগণের উৎপাতে ঋষিগণ নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম করিতে পারেন নাই। রাবণের নিধনে সম্প্রতি তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্রের বীরত্বই তাঁহাদের এই উৎপাত-শান্তির কারণ। অতএব মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিনন্দন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে যথাবিধানে সমাদর করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন। পরে সুবক্তা অগস্ত্য মুনি রামকে আশীর্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র! তুমি রাবণাদি নিশাচরগণকে বিনাশ করে জগতের মহান্ উপকার সাধন করেছ; বিশেষতঃ ইন্দ্রজিতের নিধনে, শুধু আমরা নই, দেবতারাও নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আমরাও জানি যে, রাক্ষসগণের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ সর্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী।"

রাম অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মহাভাগ! আপনি রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ অপেক্ষা ইন্দ্রজিতের অধিক প্রশংসা করছেন, এর কারণ কি?"

অগস্ত্য বলিলেন—"হে রামচন্দ্র! তুমি রাবণাদি রাক্ষসগণের উৎপত্তির কথা কিছু জান না; অতএব আমি সব ঘটনা বলছি, শোন।

"পুরাকালে পুলস্ত্য নামে এক মহাতপা ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। বিশ্রবা নামে তাঁর এক পুত্র জন্মে। কুবের এই বিশ্রবার পুত্র। কুবের বহুকাল উৎকট তপস্যা করে অক্ষয়ধনের অধিকারী ও যক্ষগণের রাজা হলেন। তিনি তাঁর পিতার আদেশে রাক্ষস-পরিত্যক্ত লঙ্কানগরীতে রাজধানী স্থাপন করলেন।"

রামচন্দ্র সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্, কুবেরের পূর্বেও কি রাক্ষসের উৎপত্তি হয়েছিল ?"

অগস্ত্যমুনি বলিতে লাগিলেন—"যক্ষ ও রক্ষ এই উভয় কুল এক সময়েই ব্রহ্মা হতে জন্মগ্রহণ করেছিল। কালক্রমে রাক্ষস-কুলে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে তিন ভাই, ব্রহ্মার বর-প্রভাবে অতিশয় পরাক্রান্ত হয়ে ত্রিভুবনের উৎপীড়ন করতে লাগল। এরাই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার নির্মিত লঙ্কাপুরে প্রথম বাসস্থান স্থাপন করে। বহুকাল পরে ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণের অনুরোধে যুদ্ধ করে মালীকে নিহত করেন ; অবশিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয় আত্মীয়গণসহ লঙ্কা পরিত্যাগ করে পাতালে প্রবেশ করে। সেই সময় লঙ্কাপুরী প্রাণিশূন্য হয়েছিল। লঙ্কায় কুবেরের রাজধানী স্থাপিত হলে পাতালবাসী রাক্ষসেরা খুব দুঃখিত হ'ল। তারা মন্ত্রণা করে সুমালীর পরমা সুন্দরী কন্যা নিকষাকে বিশ্রবা মুনির নিকট প্রেরণ করল। বিশ্রবা মুনি যখন তপস্যা করছিলেন, তখন নিকষা গিয়ে তাঁর নিকটে পুত্রবর প্রার্থনা করল। মুনি তাকে বর প্রদান করে বললেন—'তোমার সন্তানগণ অতিশয় উগ্রস্বভাব হবে।' এই কথা শুনে দুঃখিতা হয়ে নিকষা তাঁকে

অনেক অনুনয় করল। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মুনি বললেন, 'তোমার কনিষ্ঠ পুত্র পরম ধার্মিক ও দীর্ঘজীবী হবে।' অনন্তর বিশ্রবা হতে প্রথমে রাবণ, পরে কুম্ভকর্ণ, তৎপর শূর্পণখা এবং অবশেষে বিভীষণ জন্মগ্রহণ করল। নিকষা এই চারিটি সন্তান লাভ করে একান্ত প্রীত হ'ল।

"তারপর রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয় বহুকাল তপস্যা করে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করল। ব্রহ্মা তাদের বর দিতে এলে রাবণ এই বর প্রার্থনা করল, 'আমি যেন সুরাসুর প্রভৃতির অবধ্য হই।' কিন্তু সে তুচ্ছ বোধে সেই সময় নর ও বানরের নাম উল্লেখ করল না। কুম্ভকর্ণের প্রকাণ্ড আকার ও অসীম পরাক্রমের বিষয় অবগত হয়ে দেবগণ পূর্বেই নিতান্ত ভীত হয়েছিলেন, সেই জন্য তাঁরা কুম্ভকর্ণের বরপ্রার্থনার সময়ে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করলেন। দেবগণের প্রার্থনামতে ভগবতী সরস্বতী কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করে চিরকাল সুখে নিদ্রা যাবার বর প্রার্থনা করালেন। এর পরে ধর্মাত্মা বিভীষণ প্রার্থনা করল, 'আমার যেন চিরদিন ধর্মে অচলা মতি থাকে।' ব্রহ্মা তিনেরই প্রার্থনা 'তথাস্তু' বলে অনুমোদন করলেন। পরে রাবণের অনেক অনুনয়ে কুম্ভকর্ণের ছয় মাস অন্তে এক দিন জাগরণের বিধান করে ও সেই দিনের জন্য তাকে সকলের অবধ্য বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

"অনন্তর পাতালপুরে মাতামহের সহিত সাক্ষাৎ করে রাবণ জানতে পারল যে, লঙ্কা অতি মনোহর স্থান। উহা ত্রিংশৎ

যোজন বিস্তৃত, শত যোজন দীর্ঘ ও সুবর্ণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। তখন লঙ্কার অধিকারে রাবণের লোভ জাগল। সে অবিলম্বে দূতদ্বারা কুবেরকে জানাল যে, 'আমার মাতামহের অধিকৃত লঙ্কাপুরী শীঘ্রই আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।' কুবের পিতার উপদেশে লঙ্কা পরিত্যাগ করে কৈলাস পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগল। রাবণ মাতামহ প্রভৃতি আত্মীয়গণসহ লঙ্কায় রাজধানী স্থাপন করল।

"কিছুকাল পরে রাবণ ময়দানবের কন্যা পরমাসুন্দরী মন্দোদরীকে বিবাহ করল। তারপর ভ্রাতৃদ্বয় এবং ভগিনীরও যথাযোগ্যরূপে বিবাহ কার্য সম্পাদন করল। কালক্রমে রাণী মন্দোদরীর এক পুত্র হ'ল। সে জন্মিবামাত্রই মেঘের ন্যায় গর্জন করেছিল বলে তার নাম মেঘনাদ রাখা হ'ল।

"তারপর সৈন্যসামন্তসহ রাবণ দিগ্বিজয়ে গমন করল এবং অচিরেই নানা দেশে পরিভ্রমণ করে পৃথিবীর সকল বীরকেই পরাস্ত করল ; কেবল হৈহয় ভূপতি ও বানররাজ বালীর নিকটে কিছু লঘুতা স্বীকার করতে হয়েছিল।

"বহুকাল পরে দিগ্বিজয় হতে লঙ্কায় প্রত্যাগত হয়ে রাবণ শুনল যে, তার পুত্র মেঘনাদ বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অগ্নি-দেবকে সন্তুষ্ট করেছে এবং সেই থেকে এই বর লাভ করেছে যে, যেদিন নিকুম্ভিলার যজ্ঞাগারে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে সে রণে প্রবেশ করবে, সেই দিন আর কেউ তাকে পরাজয় করতে পারবে না। পুত্রের এই সম্পদের কথা শুনে রাবণ অতিশয় আনন্দিত হ'ল।

পরে পুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সঙ্গে মহা-আড়ম্বরে স্বর্গপুরী জয় করতে গমন করল।

"দুর্জয় রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত দেবগণ একে একে পলায়ন করলে সুরপতি ইন্দ্রের সহিত তার তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর রাবণ মূর্ছিত হয়ে পড়ল। মেঘনাদ তৎক্ষণাৎ অগ্রবর্তী হয়ে পুরন্দরকে আক্রমণ করল এবং অনতিবিলম্বে তাঁকে নাগপাশে বন্ধন করে পিতৃসমীপে নিয়ে গেল। রাবণ সংজ্ঞালাভ করে মেঘনাদকে আনন্দভরে আলিঙ্গন করল এবং পাশবদ্ধ ইন্দ্রকে নিয়ে মহানন্দে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করল। অমরাবতীতে হাহাকার শব্দ উঠল। অনন্তর ব্রহ্মা লঙ্কায় গিয়ে রাবণ ও মেঘনাদের নিকটে অনুরোধ করে ইন্দ্রকে মুক্ত করলেন। সেই থেকে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নামে খ্যাত হ'ল।

"দিগ্বিজয়কালে রাবণ অনেক দৈত্য, দানব ও গন্ধর্ব প্রভৃতিকে বিনাশ করে তাদের ভার্যা, ভগিনী ও কন্যা প্রভৃতি শতসহস্র রমণী হরণ করে এনেছিল। তাদের গর্ভে রাবণের অনেক সন্তান জন্মাল। ক্রমে পুত্রপৌত্রে লঙ্কাপুরী পরিপূর্ণ হ'ল। দানবগণের সহিত যুদ্ধকালে রাবণ আপন ভগিনীপতিকে অজ্ঞাতসারে বিনাশ করে। বিধবা শূর্পণখা রোদন করতে করতে রাবণের পদতলে পতিত হলে রাবণ তাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা দিয়ে চতুর্দশ সহস্র সেনাসহ খর ও দূষণকে তার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত করল। রাবণের নির্দেশক্রমে শূর্পণখা জনস্থানে বাস করতে লাগল। হে রামচন্দ্র!

তোমাদের পঞ্চবটী-অবস্থানকালে এই শূর্পণখাই রাবণবধের সূত্রপাত করে।”

এই বলিয়া তপোধন অগস্ত্য নিরস্ত হইলেন। পরে সমবেত মুনিগণ, ভ্রাতৃগণসহ রামকে অশেষবিধ ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ করিতে করিতে যথাস্থানে গমন করিলেন। রামচন্দ্রও ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যের হিতাহিত-চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন। কি উপায়ে প্রজাগণের সুখবৃদ্ধি হইবে এবং কি করিলে তাহারা সন্তুষ্ট থাকিবে, তিনি নিরন্তর কেবল এই চিন্তা ও এই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। প্রজাগণের মনের ভাব ও সুখদুঃখের কথা জানিবার জন্য তিনি কতিপয় গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা ছদ্মবেশে নানা স্থানে পর্যটন করিয়া যাহা যাহা জানিতে পারিত, রামের নিকটে আসিয়া তাহার সমুদয়ই নিবেদন করিত। প্রজাগণ সকলেই রামের প্রশংসা করিত, দূতগণও আসিয়া তাঁহাকে তাহাই নিবেদন করিত।

এক দিন রামচন্দ্র গুপ্তচর দুর্মুখকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা সর্বদাই আমার প্রশংসার কথা বলে থাক। ভাল, একজন লোকের মুখেও কি আমার কোন নিন্দার কথা শুন না?”

দুর্মুখ বিনীতভাবে নিবেদন করিল—“মহারাজ! এক দিন কোনও স্থানে অনেকগুলি লোক সমবেত হয়ে বলছিল, 'আমাদের নূতন মহারাজের শাসনগুণে আমরা বড়ই সুখে কালযাপন করছি। মেঘ যথাকালে উপযুক্ত বারিবর্ষণ করছে; পৃথিবীও

উর্বরা হয়ে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ফলশস্য প্রদান করছে। যখন যেখানে যা রোপণ করা যায় তাই কালে অঙ্কুরিত ও ফলিত হচ্ছে। এতে বোধ হয় যেন মেঘ এবং পৃথিবীও আমাদের ন্যায় আমাদের রাজার শাসন প্রতিপালন করছে।' ইতিমধ্যে একজন বলল, 'মহারাজার শুধু একটি কাজ সমস্ত প্রজার অমঙ্গলের কারণ হয়ে উঠেছে। যে নারী বহুদিন পরপুরুষের আবাসে বাস করেছে তাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলে অশান্তিরই সৃষ্টি হয়ে থাকে।' অনেকে অগ্নি পরীক্ষার কথা বললেও বেশার ভাগ লোক তা মানল না।"

দুর্মুখ এই বলিয়া রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। রাম বুঝিলেন, সীতাকে অন্তঃপুরে স্থান দেওয়ায় প্রজাদের অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে। প্রজানুরঞ্জক রাম আকুলভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দুর্মুখ এই বলিয়া, রাজাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, রাম অনেকক্ষণ আকুলভাবে চিন্তা করিলেন; পরে নিকটবর্তী ভৃত্যদ্বারা ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র ধীর ও গম্ভীরভাবে সমুদয় কথা তাঁহাদের নিকটে বলিয়া লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন—"বৎস লক্ষ্মণ! একদিন জনকনন্দিনী আমার নিকটে তপোবন দর্শনের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। তুমি সেই ছলে তাঁকে বাল্মীকির তপোবনে রেখে এস। প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম; আমি সেই ধর্মানুসারেই সীতাকে

বিশুদ্ধচরিত্রা জেনেও মিথ্যা অপবাদের ভয়ে পরিত্যাগ করছি; তোমরা কোনও আপত্তি করে আমার রাজধর্মপালনে বিঘ্ন এনো না। সীতার নির্বাসন ভিন্ন এই মিথ্যা অপবাদ-মোচনের আর কোনও উপায় নেই।"

ভ্রাতৃগণ রামচন্দ্রের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না। নিতান্ত দুঃখিতমনে নিজ নিজ ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন লক্ষ্মণ জানকীকে রথে আরোহণ করাইয়া বাল্মীকির তপোবনের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিরূপে পতিপরায়ণা গর্ভবতী সীতাকে সেই নিদারুণ বাক্য শুনাইবেন তাহা ভাবিয়া একান্ত আকুল হইলেন; তাঁহার নয়নযুগল জলে পরিপূর্ণ হইল। তাহা দেখিয়া জানকী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, এ কি? তুমি রোদন করছ কেন? রথে আরোহণ করা অবধি তুমি হাসিমুখে একটি কথাও বল নি, এর কারণ কি?"

লক্ষ্মণ কিছুকাল ইতস্ততঃ করিয়া, অতিকষ্টে অধোমুখে রামের আদেশ জানাইলেন। তাহা শুনিবামাত্রই জানকী মূর্ছিতা হইলেন। কিছুকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণকে কহিলেন—"বৎস! আমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তাতে ইচ্ছা হয় যে, এই দণ্ডেই জাহ্নবীর জলে জীবন বিসর্জন করি।"

লক্ষ্মণ বলিলেন—"দেবী! আপনি জীবনত্যাগ করলে

আপনার যে কেবল আত্মহত্যার পাপই হবে এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে সন্তানবিনাশের পাপও হবে। অতএব ধৈর্য অবলম্বন করুন। নিকটেই মুনির আশ্রম দেখা যায়, তথায় অবস্থান করুন। রঘুকুলের দেবতাগণ আপনার মঙ্গল বিধান করবেন। অচিরেই আপনি তনয়ের মুখদর্শনে এই দুঃখ বিস্মৃত হতে পারবেন এবং দেবগণের আশীর্বাদে একদিন আপনার এই সমস্ত দুঃখের অবসান হবে।" এইরূপ নানা প্রবোধ-বাক্যে আশ্বাস দিয়া লক্ষ্মণ পুনর্বার কহিলেন—"দেবী! আপনি জানেন যে, আমি চিরকালই দাদার অনুগত ভৃত্য; তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করতে আমার ক্ষমতা নেই। অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

সীতা বলিলেন—"বৎস! তোমার অপরাধ কি? সকলই আমার দুরদৃষ্টের ফল। তুমি অযোধ্যায় ফিরে শ্বশ্রূঠাকুরাণীদিগকে ও তোমাদের রাজাকে আমার প্রণাম জানাবে, আমার ভগিনীদিগকে আমার আশীর্বাদ বিজ্ঞাপন করবে। আমি বনবাসিনী হয়ে ঈশ্বরের নিকটে চিরদিন তোমাদের মঙ্গল কামনা করব। তোমরা হয়ত এই অভাগিনীকে ভুলতে পারবে, কিন্তু জীবন থাকতে আমি ক্ষণকালের জন্যও তোমাদিগকে বিস্মৃত হতে পারব না।"

অনন্তর লক্ষ্মণ জানকীকে ভক্তিভরে প্রণাম ও নানা কথায় সান্ত্বনা করিয়া রথারোহণে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল, জানকী অনিমেষনয়নে সেই রথের

৫

দিকেই চাহিয়া রহিলেন। রথ দৃষ্টিপথের অতীত হইলে আবার অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাতপা মহর্ষি বাল্মীকি যোগবলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অবিলম্বে সীতার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং স্নেহপূর্ণ বচনে নানারূপে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া ও সান্ত্বনা করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর তপোধন সর্বসমক্ষে সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে জানকি! রামচন্দ্র তোমাকে নিরপরাধা, পতিব্রতা ও শুদ্ধাচারিণী জেনেও কেবল প্রজারঞ্জনের নিমিত্তই যে নির্বাসিত করেছেন, তা আমি যোগবলেই জেনেছি। তোমার শুদ্ধচারিতার বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহের সম্ভাবনা নেই। তাই বলি তুমি নিশ্চিন্তমনে পিত্রালয়ের ন্যায় আমার এই আশ্রমেই অবস্থান কর।"

কালক্রমে জানকী দুইটি যমজ কুমার প্রসব করিলেন। আশ্রমস্থিত মুনিপত্নীগণ, কন্যার স্নেহে যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তপোধন যথাকালে যথাবিধানে কুমারদ্বয়ের জাতকর্মাদি নির্বাহ করিয়া জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন।

মুনি ও মুনিপত্নীগণের যত্নে লালিত-পালিত হইয়া কুশ ও লব দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তপোধন যথাকালে তাহাদের শিক্ষা বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমারেরাও অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির প্রভাবে অনায়াসে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা রূপে ও গুণে সকলেরই প্রিয় হইয়া

উঠিল। যদিও ইহা সীতার পক্ষে নিতান্তই সুখের কারণ, তথাপি তিনি রামের অদর্শনজনিত দুঃখ ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

এদিকে লক্ষ্মণ সীতাকে বনে রাখিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। রামচন্দ্র তাঁহার মুখে সীতার বিলাপকাহিনী শ্রবণ করিয়া যদিও অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন, তথাপি ধৈর্যবলে মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করিলেন এবং রাজকার্যে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া সীতাবিয়োগের দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদা একটি ব্রাহ্মণ মৃত শিশু ক্রোড়ে লইয়া রাজদ্বারে আসিয়া হাহাকার রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "অবশ্যই রাজ্যমধ্যে কোথাও কোন পাপাচরণ হয়, তা না হলে অকালমৃত্যু ঘটবে কেন?" এইরূপ চিন্তা করিয়াই তিনি শীঘ্রই নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পাপাচারের প্রতিবিধান করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণতনয় পুনর্জীবিত হইয়াছে। তাহার পর ঐ ব্রাহ্মণ রামচন্দ্রকে নানা প্রকার আশীর্বাদ করিয়া পুত্রসহ নিজগৃহে গমন করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। নানা স্থানের ঋষিগণ ও রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞে আগমন করিলেন। কুশ-লবকে সঙ্গে করিয়া বাল্মীকি মুনিও তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। কুশ ও

লব মুনিবরের উপদেশমতে তাঁহার প্রণীত রামায়ণ নানা স্থানে গান করিতে লাগিল। রামচন্দ্র লোকপরম্পরায় এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদিগকে সমাদর করিয়া রাজসভায় আনয়ন করিলেন। তাহারাও রাজার আদেশমত গান করিতে আরম্ভ করিল। কুশ ও লবের অতি মধুর স্বরে ও রামায়ণের রচনামাধুর্যে সকলেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন এবং তাহাদের মনোহর আকৃতি দর্শনে বিস্মিত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, ইহারা যদি জটাবল্কলধারী না হইত, তবে রামচন্দ্রের সহিত ইহাদের আকৃতি-গত কোনও বৈষম্য থাকিত না।

রাজা রামচন্দ্র তাহাদের গীতিশ্রবণে পুলকিত হইয়া তাহাদিগকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহারা উহা গ্রহণ না করিয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিল—"মহারাজ! আমরা বনবাসী ; বনফলেই জীবন ধারণ করে থাকি। আমাদের ধনে কোন প্রয়োজন নেই।"

তাহাদের আকৃতি-দর্শনেই রামচন্দ্রের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, বোধ হয় ইহারা সীতার সন্তান। এক্ষণে ইহাদিগকে বাল্মীকির তপোবনবাসী জানিয়া তাঁহার সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। তখন তিনি বাল্মীকির নিকটে যাইয়া প্রকৃত কথা অবগত হইলেন এবং বলিলেন—"ভগবন্! জানকী যদি সর্বসমক্ষে আত্মশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন, তবে আমি তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারি।"

তপোধন বাল্মীকি তাহাতে সম্মত হইয়া সীতাকে আনয়নের জন্য আশ্রমে গমন করিলেন। এদিকে, 'আগামী দিবসে সীতা সভাস্থলে নিজের বিশুদ্ধচারিতার পরিচয় দিবেন', এই কথা দূতমুখে সর্বত্র বিঘোষিত হইল।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দলে দলে লোক আসিয়া সভাস্থল পূর্ণ করিতে লাগিল। সকলে যথাযোগ্য স্থানে অবস্থান করিলে পর, ভগবান্ বাল্মীকি সীতাসহ সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন—"হে পৌর ও জানপদগণ! আমি নিশ্চয় জানি, জনকনন্দিনী সীতা একান্ত পতিপ্রাণা ও বিশুদ্ধচরিত্রা। যদি আমার কথায় তোমাদের একটুও বিশ্বাস থাকে, তবে এঁকে নিষ্পাপা ও সানুশীলা জেনে এঁর পুনর্গ্রহণের জন্য রাজা রামচন্দ্রকে অনুরোধ কর।"

বাল্মীকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও যখন প্রজাবর্গ কোনও কথা বলিল না, তখন রামচন্দ্র মুনিকে কহিলেন—"ভগবন্! এখন আত্মবিশুদ্ধির পরিচয় সীতাকে স্বয়ং দিতে হবে। এ ছাড়া আমি আর অন্য উপায় দেখছি না।"

তখন অধোমুখী সীতা দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন—

"যদি আমি রাম বিনা অন্য কোন পুরুষকে মনেও কখন স্থান না দিয়ে থাকি, তবে হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি।"

এই কথা তিন বার উচ্চারিত হইলে পাতাল হইতে এক

স্বর্ণসিংহাসন উত্থিত হইল। দেবী বসুমতী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া সেই সিংহাসনে আরোহণপূর্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন। আকাশে দেবগণ এবং সভাস্থলে মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ "সাধু! সাধু!" বলিতে লাগিলেন। কুশ ও লব মাতার অদর্শনে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গও সচ্চরিত্রতার প্রচুর প্রমাণ পাইয়া নিতান্ত বিস্মিত ও লজ্জিত হইল।

ইহা দেখিয়া রামচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। পরে ক্রোধভরে বসুন্ধরাকে কহিলেন—"বসুন্ধরে! তুমি আমার সীতাকে অবিলম্বে এনে দাও, নচেৎ এই অগ্নিবাণেই তোমাকে ভস্মীভূত করছি।" এই বলিয়া ধনুরুত্তোলন করিবামাত্র আকাশবাণী হইল—"হে রামচন্দ্র! তোমার এইরূপ অনুচিত ক্রোধের বশীভূত হওয়া শোভা পাচ্ছে না। সীতার জন্য শোকাভিভূত হওয়াও তোমার উচিত নয়। সীতা নিজ সচ্চরিত্রতার বলেই স্বয়ং পাতালপুরে প্রবেশ করেছেন। তিনি আর এই পাপময় সংসারে থাকতে ইচ্ছা করেন না। বৈকুণ্ঠধামে সীতার সহিত তোমার পুনর্মিলন হবে।"

এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাম ক্রোধ ও শোক পরিত্যাগ পূর্বক পুনরায় প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কুশ ও লবকে সর্বদা নিকটে রাখিয়া আপনার দৃষ্টান্তে নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি বৃদ্ধা মহিষীগণ যথাসময়ে পরলোকগমন করিলেন। রামচন্দ্র মহা-সমারোহে তাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পাদন করিলেন। তৎপর

নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবঋণ ও ঋষিঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

একদা যমুনার তীরবাসী ঋষিগণ আসিয়া রাজ-সমীপে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ! আমরা রাবণের ভাগিনেয় মহাবল লবণ নামক অসুরের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত উদ্বেগে কাল-যাপন করছি।"

রামচন্দ্র লবণবিনাশের জন্য শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন। শত্রুঘ্নও লবণকে বিনাশ করিয়া অচিরে তথায় শান্তি সংস্থাপন করিলেন। পরে নিজ পুত্র সুবাহুকে মথুরায় এবং শত্রুঘাতীকে বিদিশানগরীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অনন্তর ভরত রামের আদেশে সিন্ধুনদের তীরবর্তী গন্ধর্বরাজ্য গান্ধারদেশ জয় করিয়া তথায় মনোহর দুইটি রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং আপনার এক পুত্র তক্ষককে তক্ষশিলায় এবং অন্যতম পুত্র পুষ্কলকে পুষ্কলাবতে রাজা করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন।

রামের অনুমতিক্রমে লক্ষ্মণও কারুপদ এবং মল্লভূমি নামক দুইটি জনপদ জয় করিয়া কারুপদে তদীয় এক পুত্র অঙ্গদকে এবং মল্লভূমিতে অন্য পুত্র চন্দ্রকেতুকে রাজত্ব প্রদান করিলেন। পরে তিনি রাজসমীপে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিলেন।

রামচন্দ্র বিন্ধপর্বতের নিকটবর্তী স্থানে কুশের জন্য কুশাবতী

এবং লবের জন্য শ্রাবস্তী নামে নগরীদ্বয় নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকে তত্তৎস্থলের অধিপতি করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর যমরাজ তাপসের বেশে শ্রীরামের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"মহারাজ! আপনার নিকটে আমি অতি নির্জনে কিছু বলতে ইচ্ছা করি। আপনি দ্বারে এমন কোনও মহাপুরুষকে নিযুক্ত করুন যাঁকে অতিক্রম করে কেউ যেন আমাদের নিকট আগমন করতে না পারে। আর আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, মন্ত্রণাকালে যদি কেউ অতর্কিতভাবে আমাদের সমীপে উপস্থিত হয়, কিংবা গুপ্তমন্ত্রণা শ্রবণ করে, আপনি তাকে বর্জন করবেন; পরমাত্মীয় হলেও তাকে ক্ষমা করবেন না।"

রামচন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন কার্যকুশল লক্ষ্মণকেই দ্বারদেশে থাকিতে আদেশ করিলেন।

রামচন্দ্রকে এইরূপে বচনাবদ্ধ করিয়া যমরাজ নির্জনে যাইয়া কহিলেন—"ভগবন্! আপনাকে পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনি বৈকুণ্ঠধাম শূন্য করে যে জন্যে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দেবগণের সেই কার্য সমাহিত হয়েছে। অতএব এখন আর আপনি এখানে অবস্থান করে দেবগণকে বিরহ-কষ্ট প্রদান করবেন না। ত্বরায় বৈকুণ্ঠধামে প্রতিগমন করুন।"

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে কোপনস্বভাব দুর্বাসা মুনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া রামের

সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লক্ষ্মণ কহিলেন—"ভগবন্! আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

ইহাতেই ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্বাসা কহিলেন—"তুমি অবিলম্বে রামকে আমার আগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপন কর। অন্যথা আমি শাপদানে তোমাদের সকলকে ভস্মীভূত করব।"

কুলনাশের অপেক্ষা নিজের মৃত্যুই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণ রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং দুর্বাসার আগমন-সংবাদ নিবেদন করিলেন।

রামচন্দ্র যমরাজকে বিদায় করিয়া সত্বর দুর্বাসার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকেও প্রার্থিতদানে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তখন নিজের পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন—"আর্য! দৈবে যাহা সংঘটিত হয়, তদ্বিষয়ে খেদ করা বৃথা।" এই বলিয়াই অগ্রজের পদবন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রামসংসর্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবন-ধারণ মরণাপেক্ষা ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ সরযূজলে নিমগ্ন হইলেন। অমনি দেবরথ আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গেল।

অতঃপর রামচন্দ্রও জীবন বিসর্জন করাই স্থির করিলেন। ভরত এবং শত্রুঘ্নও রামের অনুগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া পুরবাসিগণের কেহই অযোধ্যায় থাকিতে চাহিল না, সকলেই তাঁহাদের অনুগমন করিল। সকলে

সরযূতীরে উপনীত হইলে, সুগ্রীবাদি প্রধান প্রধান বানরগণ ও বিভীষণ প্রভৃতি ধর্মাত্মা রাক্ষসবৃন্দ তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল। রামচন্দ্র জাম্ববান্‌, মৈন্দ ও দ্বিবিদ, এই তিনজনকে কলির আগমন পর্যন্ত ধরাতলে থাকিতে আদেশ করিয়া, বিভীষণ ও হনুমানকে অমরবর প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য সকলকে লইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

শেষ